নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের সকলের রব। সুতরাং তারই ইবাদত কর। এটিই সরলপথ। (আল কুরআন ১৯:১৬)

মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ প্রদর্শক

web: www.masiksaralpath.in



৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
রমাযান-শাওয়াল ১৪৪০
জুন ২০১৯



Monthly Saralpath

8th Years, Edition No.-1
June -2019

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৮ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
রমাযান-শাওয়ালঃ ১৪৪০ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ঃ ১৪২৬ বাংলা
জুনঃ ২০১৯ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইলঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.masiksaralpath.com

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়
ভারতের জাতীয় নির্বাচন

সদ্য অনুষ্ঠিত হল মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জাতীয় নির্বাচন। ভারতীয় জনতা পার্টি তাতে নিরঙ্কুশ ভাবে বিজয়ী হয়ে পুনর্বার বৈচিত্রে পরিপূর্ণ মহামিলনের দেশের দণ্ডমুণ্ড কর্তার আসনে আসীন হল। প্রধানমন্ত্রী দামোদর দাস নরেন্দ্র মোদীর পূর্বের তুলনায় আরও বেশি শক্তি অর্জন করে দেশকে সংবিধানের আদলে ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালনা করার শপথ দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় নেতৃবর্গ ও প্রতিনিধি সমূহের সম্মুখে গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে এত মানুষের সামনে শপথ গ্রহণ পরবর্তীতে যদি শপথকারী তাঁর চাল-চালনে, আচার-আচরণে সংবিধানে গৃহীত নীতি-নৈতিকতার বিরোধী মনভাব প্রকাশ করেন, তাহলে এটা হবে শপথের নামে এক প্রকার প্রহসন। তাছাড়া যাঁরা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দূর দর্শনের মাধ্যমে দেশের শতাধিক কোটি নাগরিক রয়েছেন, তাঁরাও সকলেই সাক্ষী। নিঃসন্দেহে ক্ষমতার বলে মানুষকে জব্দ করা গেলেও মানুষের হৃদয়ের আর্ত শ্বাস-প্রশ্বাস এমন প্রবঞ্চকদের অতীতে ভস্মিভূত করেছে এবং তাদের ঠাঁই হয়েছে ইতিহাসের অভিশপ্ত অধ্যায়ে।

তবে আশার কথা যে মান্যবর মোদী জেতার অব্যবহিত পরেই সকলের আস্থা অর্জন ও বিশ্বাস লাভের প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘অসৎ নিয়াতে তিনি কোনো কাজ করবেন না।’ তবে দেশের নেতা সৎ হলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে যারা বাস্তবায়ণ করেন তাঁরা যদি অনুরূপ না হোন, তাহলে তাঁর সংকল্প কোনো দিনই ফলপ্রসূ হবে না। ক্ষমতা আল্লাহ্ দান করেন, কেড়ে নেন তিনি, তিনিই সম্মানিত করেন এবং তিনিই তা প্রত্যাহার করে নেন। সার্বিক কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম (সূরাতুল্ আলে ইমরাণ ৩/২৬)। আয়াতের ভাবার্থানুযায়ী আমরা ইতিহাস হতে সবক নিতে পারি। ইংরেজ যারা ভারতে রাজ করেছিল। যাদের ভাবনাতে ও শোষিতদের হৃদয়ে তখন এমন কথা খুব কমই উঁকি মারত যে, তাদের রাজ অস্তমিত হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজদের অপশাসনের বিরুদ্ধে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়রা সোচ্চার হয়েছেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের আর্তনাদ ও প্রতিবাদের সামনে ইংরেজদের বুলেটও ক্ষান্ত হয়েছে। তারা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

কত নমরূদ, কত ফিরাউন, কত শাদ্দাদ ও কারুন
আসিয়াছে মোর চলার পথে হইয়া বাধা দারুন।
পড়ি নাই আমি নমরূদী হুতাশনে
বিকাইনি আমি বিপুল কারুনী ধনে
আমি আজিও উচ্চ শীরে।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, সময়কে গালি দিও না। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘‘আমিই সময়ের (মালিক) রাত ও দিনকে নিত্য নতুন নিয়ে আসি এবং তা বিলীন হয়ে যায়। আর একজন শাসকের পরে অন্য শাসককে আনি’’ (সিলসিলাহ্ সাহীহাহ্ ৫৩২)।

সুতরাং আতংকিত হওয়ার কিছু নেই এবং শাসকের প্রতি গাল-মন্দ করাও সমীচীন নয়। যাতে তিনি ভাল কাজ করতে পারেন সেজন্য তাঁর হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য আমরা ভারতবাসী প্রার্থনা করি।

‘দুর্যোগ রাতি পোহায়ে আবার প্রভাত আসিবে ফিরে।’ অভিশাপ দেওয়াটা ভাল মানুষের পরিচয় নয়। যেমন ভালো কাজে সহযোগিতা ও তা স্বীকার করাটা ভাল ব্যক্তিত্বের পরিচয়। হৃদয়ে মালিকানা ও তাকে পরিবর্তন করার শক্তি একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র হাতে। সুতরাং আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই। পছন্দ ও অপছন্দের শাসক মানুষের কর্মফল। নিজেরা সৎ হলে সৎ শাসক, অন্যথা অসৎ শাসক। বিধায় আত্ম সমীক্ষার প্রয়োজন।

ভোটপর্ব চুকে যাওয়ার পরে মুসলিম-দলিতদের তথা বিরোধীদের সাথে যে সমস্ত দুর্ব্যবহার শুরু হয়েছে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা হোক। নতুবা

নদীর এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে,
এই তো নদীর খেলা।
সকাল বেলায় আমীর রে ভাই,
ফকীর সন্ধে বেলা।

আমরা সরল পথ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সকলেই স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হার্দিকভাবে প্রকৃত দেশপ্রেমী করে তোলেন, মৌখিকভাবে নয় — আমীন।

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

হাজ্জ কেন ও কীভাবে করবেন

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَاِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِیۡمَ مَکَانَ الۡبَیۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِکۡ بِیۡ شَیۡئًا وَّطَهِّرۡ بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَالۡقَآئِمِیۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ۝ وَاَذِّنۡ فِی النَّاسِ بِالۡحَجِّ یَاۡتُوۡکَ رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِرٍ یَّاۡتِیۡنَ مِنۡ کُلِّ فَجٍّ عَمِیۡقٍ ۝

স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কা'বাগৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম। (তাকে বলেছিলাম) আমার সাথে কোনো অংশীদার বানাবে না এবং তাওয়াফকারী, স্বলাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তি ও রুকু ও সাজদাকারীদের জন্য আমার গৃহ (কা'বাকে) পরিচ্ছন্ন রেখো। আর তুমি লোকেদের মাঝে হাজ্জের ঘোষণা দাও। তারা যেন তোমার নিকট পায়ে হেঁটে, দুর্বল (উট) বাহনের উপর (আরোহন করে) দূরদূরান্ত এলাকা হতে তোমার নিকট আসে (সূরাহ্ হাজ্জ ২৬-২৭)।

'হাজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কোনো বিষয়ে ইচ্ছা করা, ভ্রমণ করা ও অন্যত্র গমন করা। শারীআতী পরিভাষায় 'হাজ্জ' হল হাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে শারীআত নির্দ্ধারিত রীতি-নীতি সমূহকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পন্ন করা। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় মানুষের জন্য যে প্রথম ঘর মক্কাতে নির্মিত হয়েছে সেটি বরকতপূর্ণ এবং বিশ্ব জগতের জন্য পথ নির্দেশক। সেখানে বহু স্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে। যেমন মাকামে ইব্রাহীম বা ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর দাঁড়ানোর স্থান (তাঁর পদচিহ্ন) যে সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। মানুষের মধ্যে যার সেখানে পৌঁছাবার সক্ষমতা রয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের হাজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে তার জানা উচিৎ যে, মহান আল্লাহ্ বিশ্ব জগত হতে মুখাপেক্ষীহীন' (সূরাতু আলে ইমরাণ ৯৬-৯৭)।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হল হাজ্জ। হাজ্জ এক ধারে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত। অর্থ ব্যয়ের সাথে সাথে এই ইবাদাতে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে মনে হবে বিশ্ব মুসলিমদের এই উপলক্ষ্যে একে অপরের সাথে মেলামেশার সুযোগ আল্লাহ্ আমাদের জন্য দিয়েছেন। সকল শ্রেণির মানুষের একই পোষাক, ইহ্রামের অভিন্নতা ইসলামী সাম্যের হৃদয়গ্রাহী পরিবেশে দুষ্টু থেকে দুষ্টু ও কঠোর থেকে কঠোর মানুষের হৃদয়ে অন্য অনুভূতি ও ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। ব্যতিক্রমী ব্যক্তি ব্যতীত অশ্রু ভারাক্রান্ত না হয়ে থাকতে পারেনা। নিজের এলাকাতে সে নিজেকে অন্য কিছু ধারণা করলেও সেখানে উপস্থিত সকলেই আত্মহারা হয়ে মহান প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে এক নৈসর্গিক দৃশ্য যা দর্শনে চক্ষু ও বিবেক পুলকিত ও আলোড়িত হয়। কেন হয়? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের হাজ্জ করল অতঃপর অশ্লীল কোনো কাজ ও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে কোনো আচরণ করল না সে ব্যক্তি সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় হয়ে গেল' (সহীহ্ বুখারী ১৮২০, মুসলিম ১৩০০)। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হাজ্জের একটিই বিনিময় আর তা হল জান্নাত' (সহীহুল বুখারী ১৭৭৩)। তিনি আরও বলেন, 'নিয়মিত হাজ্জ ও উমরাহ্ করতে থাকো কেননা এ দুটি (ইবাদাত) অভাব দূর করে ও পাপ মোচন করে যেমন হাপর লোহার মরীচিকাকে দূরীভূত করে (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ১১৮৫, নাসায়ী ২৬৩০)।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা যেখানে দিবা রাত্রি ঝরতে থাকে এমন একটি স্থানে ইবাদাতে অংশগ্রহণে যাদের হৃদয় ক্ষমতা থাকা সত্বেও কুণ্ঠিত, তাদের জন্য অন্য কথা খরচ না করলেও তারা যে দুর্ভাগ্যা তা বলতে অসুবিধার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। ছেলে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ভাল ও মন্দ জনেদের ভুরিভোজন হেতু বৈধ-অবৈধ ঋণ গ্রহণ এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ স্থানান্তর এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু হাজ্জ ও উমরার জন্য আমাদের নিকট স্বচ্ছলতার সাথে সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ জমা হলে তবেই আমরা ভেবে দেখব। নিঃসন্দেহে সংসারের সংকট ব্যতীত যে কোনো হালাল পদ্ধতিতে সেখানে পৌঁছাবার ও ফেরত আসার এবং হাজ্জ করতে আগ্রহী ব্যক্তির আয়ত্বাধীন ব্যক্তি সমূহের তার অনুপস্থিতকালীন খরচের ব্যবস্থা থাকলেই তার উপরে হাজ্জ ফরয। ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন করা অথবা সন্তানদের সাবালক হওয়া ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা, ফরয কাজে বিলম্বিত করা অপরাধের শামিল। উমার বিন খাত্তাব বলেন, 'কোনো ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি হাজ্জ না করে, তার ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করাটা দুটোই সমান' (ইবনু কাসীর ২/৭০)।

আশা করি এরপরে কোনো সক্ষম ব্যক্তি হাজ্জ করা হতে নিজেকে দূরে রাখবেন না। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন।

হাজ্জ মূলত তিন প্রকার। (ক) ‘হাজ্জে ইফরাদ’ যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যুল হিজ্জাহ্র আট তারিখ সকালে শুধুমাত্র হাজ্জের জন্যই ইহ্রাম বাঁধেন ও হাজ্জ সম্পন্ন করে ইহ্রাম খুলে ফেলেন।

(খ) ‘হাজ্জে কিরান’। কিরান শব্দের অর্থ মিলিত করা। যেহেতু হাজ্জ ও উমরাহ্র একত্রে নিয়াত করা ও উভয় ইবাদাত সম্পূর্ণ হওয়া অবধি ‘ইহরাম’ পরে থাকতে হয় সেজন্য একে হাজ্জে কিরান বলে।

(গ) ‘হাজ্জে তামাত্তু’। তামাত্তু শব্দের অর্থ হল উপকৃত ও লাভবান হওয়া। প্রথমে উমরাহ্র নিয়াতে ইহরাম পরিধান করে উমরাহ্ সম্পন্ন করতে হয়। অতঃপর ইহরাম খুলে দিয়ে হাজ্জের সময় আসলে নতুন করে হাজ্জের ইহরাম পরিধান করে হাজ সমাধা করতে হয়। ইহ্রাম খুলে দিয়ে পরবর্তী ইহ্রামের মাঝে স্ত্রী সহবাস, শিকার করা, উকুন মারা ইত্যাদি সুবিধাগুলি তার জন্য হালাল হয়ে যায়। এই লাভের জন্য একে হাজ্জে তামাত্তু বলা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জীবনে তিনটি হাজ্জ করেছেন, দুটি হিজরতের পূর্বে ও পরে বিদায় হজ্জ - হাজ্জে কিরান করেছিলেন। (বিদায় হাজ্জ বা হাজ্জাতুল বিদা’ এজন্য বলা হয় যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তারপর দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন)। এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। প্রকৃত ঘটনা হল যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জীবনে একটিই হাজ্জ করেছেন এবং চারটি উমরাহ্ করেছেন। যুলকা’দাহ্র উমরাহ্ হুদাইবিয়াহ্র উমরাহ্, হাজ্জের সাথে উমরাহ্ এবং জিঈররানাহ্র উমরাহ্ (সহীহ্ তিরমিযী ৮১৫)। যেহেতু তিনি কিরান হাজ্জ করেছিলেন। উমরাহ্ হতে হাজ্জ অবধি অপেক্ষাতে সাহাবীদের কষ্ট অনুভব করে, যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনেনি, তাদের উমরাহ্ পরে হালাল হতে বললেন। তিনিও আরো বললেন, আগে জানলে এমন সিদ্ধান্ত নিতাম না এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু আনতাম না (ভাবার্থ, সহীহুল বুখারী ১৭৮৫)।

অতএব এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান যে, ‘তামাত্তু’ হাজ্জ উত্তম। যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নেবেন, তাদের ‘কিরান’ হাজ্জই করতে হবে।

উমরাহ্র করণীয়

১। মক্কাতে উমরাহ্র নিয়াতে প্রবেশের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থান সমূহ (যাকে মীকাত বলা হয়) হতে ইহ্রাম পরিধান করা এবং তার সাথে তালবিয়্যাহ্ পাঠ।

২। কা’বার তাওয়াফ যা সাতবার করতে হয়। প্রথম তিন চক্করে শুধুমাত্র পুরুষ উমরাহ্কারীগণ রামাল বা দুলকি চালে চলবেন। অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে পূর্ণ করবেন। তাওয়াফ আরম্ভ হবে হাজারে আসওয়াদের কোণ থেকে ডান হাতে হাজারে আসওয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে বিস্মিল্লা-হি আল্লাহু আকবার বলবেন। অতঃপর ঘুরে হাজারে আসওয়াদের নিকট পৌঁছাবার পূর্বের কোণ হল রুকনে ইয়ামানী। সেটাকে বিস্মিল্লাহ্ বলে হাত দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব হলে ভাল নতুবা এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন দেওয়ার কোনো দলীল নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত ‘রব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনয়্যা হাসানাতাঁও অ ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও অক্বিনা আযাবান্নার’ পড়বেন। এবার হাজারে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছালে এক চক্কর হল। স্মরণ রাখতে হবে যে, হাজারে আসওয়াদকে বাম দিকে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। পরবর্তী চক্কর প্রথমবারের মত শুরু ও শেষ করতে হবে। সাতবার হয়ে গেলে মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে দু রাকাআত তাওয়াফের সুন্নাহ্ আদায় করতে হবে। সম্ভব না হলে কা’বার যে কোনো স্থানে দু রাকাআত পড়ে নিলে হবে। তাওয়াফকালীন ইহ্রামের কাপড়ের ডান অংশটা ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম ঘাড়ের উপরে রাখতে হবে। একে শরীআতী পরিভাষায় ইয্তিবা’ বলে। নারীদের জন্য পৃথক কোনো ইহরামের কাপড় নেই। তারা নিজেদের পোষাকেই হাজ্জ ও উমরাহ্ করবেন।

৩। অতঃপর সাফা ও মারওয়াহ্র মাঝে ‘সাঈ’ বা দৌড়। প্রথমে সাফা পর্বতের নিকটে পৌঁছে মনে মনে বলতে হবে ‘আবদাউ বিমা বাদাআল্লা-হু বিহী’ আমি সেখান থেকে শুরু করছি যেখান থেকে আল্লাহ্ (কুরআনে) শুরু করেছেন। অতঃপর তথায় কা’বার দিকে মুখ করে, তাকবীর তাহলীল, লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আল্ হামদুলিল্লাহ্ ইত্যাদি যিকর করত হাত তুলে প্রাণ খুলে দুআ করুন। তারপর মারওয়ামুখী চলতে শুরু করুন। সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানে শুধুমাত্র পুরুষগণ দৌড়ে অতিক্রম করবেন এবং মারওয়া পৌঁছে কিবলামুখী হয়ে দুআ করবেন। আপনার এক চক্কর হলো। এরপর পুনরায় সাফা পাহাড় ও মাঝে সবুজ বাতির

স্থানে হালকা দৌড় অতঃপর হেঁটে সাফা ও দুআ। এবার দুই চক্কর হল। এইভাবে সাত চক্কর হয়ে গেলে আপনি যে কোনো সেলুন অথবা নিজ হোটেলে গিয়ে চতুর্থ কাজ যেটি করবেন সেটি হল মস্তক মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। মুণ্ডন করাটাই উত্তম। মহিলাগণ শুধুমাত্র আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ কর্তন করবেন। এবার আপনার উমরাহ্ হয়ে গেল। এরপর আপনি কা'বা ঘরের তাওয়াফ যতবার করবেন পূর্বের নিয়মেই করবেন, তবে প্রথম তিন চক্করে রামাল বা দুলকি চাল চলতে হবেনা এবং বগলের ভিতর দিয়ে ইহরামের কাপড় পরতে হবে না।

হাজ্জের নিয়ম

১। ইহরাম ঃ যুল হিজ্জাহর অষ্টম তারিখ সূর্যোদয়ের পর মহান রবের সন্তুষ্টির নিয়াতে দুনিয়াবী মোহ-মমতাকে বিসর্জন দিয়ে স্নান শেষে ইহ্রামের কাপড় পরবে। এরপরেই হাজী নখ কর্তন, চুল কর্তন, উলঙ্গ হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার এবং কোনো প্রাণী শিকার হতে বিরত থাকবে।

২। তালবিয়্যাহ পাঠ ঃ উচ্চ স্বরে এবং পুনরাবৃত্তি করে লাব্বাইক আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকু, লা-শারীকা লাকা'। এই তালবিয়্যাহ্ হাজী কা'বার তাওয়াফ সহ সমস্ত দিনে কুরবানীর দিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে।

তাওয়াফে কুদূম বা মক্কা আগমনের তাওয়াফ ঃ এই তাওয়াফ তাঁদের জন্য যারা হাজ্জে ইফরাদের নিয়াতে মক্কা প্রবেশ করছেন। যাঁরা তামাত্তু হাজ্জ অথবা কিরান করবেন তাঁরা যেহেতু উমরাহ্ সম্পন্ন করার পর মক্কাতে অবস্থান করছেন, সেহেতু তাঁদের নতুন করে সেই তাওয়াফ নেই। মাক্কার স্থানীয় লোকেরা যেহেতু হারামের প্রতিবেশী সেহেতু তাদের জন্যও এই আগমনের তাওয়াফ বা তাওয়াফে কুদূম নেই।

৪। মিনা গমন ও রাত্রি যাপন ঃ ৮ যুল হিজ্জাহ্ সকালে মিনা পৌঁছাতে হবে, সেখানে হাজীগণ ৯ যুল হিজ্জাহ্ সকাল অবধি অবস্থান করবেন এবং তাঁরা সেখানে প্রত্যেক ওয়াক্তের স্বলাত নির্দ্ধারিত সময়ে পড়বেন। স্বলাত একত্রিত বা জমা করে পড়বেন না।

৫। ৯ যুল হিজ্জাহর দিন সূর্যোদয়ের পর মিনা ত্যাগ করে আরাফাহ্ পর্বতের দিকে যাত্রা করবেন এবং সেখানে মাসদিজে নামিরাতে যুহ্র ও আসরের স্বলাত একত্রিত করে সফরের ন্যায় দু' দু' রাকাআত করে পড়বেন। আরাফাতে হাজীগণ সন্ধে পর্যন্ত অবস্থান করে দুআ ও যিক্রের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করবেন।

৬। সূর্যাস্তের পর আরাফাতে মাগরিবের স্বলাত আদায় না করে হাজীগণ 'মুয্দালিফাহ্' পৌঁছাবেন অতঃপর সেখানে মাগরিব তিন রাকাআত ও এশার স্বলাত একত্রিত করে দু' রাকাআত পড়বেন। তারপর তথায় রাত্রি যাপন।

৭। ১০ম যুলহিজ্জাহ্তে (যা কুরবানীর দিন) হাজীগণ (বড় শয়তান) জামরায়ে কুবরাকে মিনা প্রান্তরে কাঁকর মারবেন ও কুরবানী করবেন এবং পুরুষ হাজীগণ মস্তক মুণ্ডন অথবা ছোট করবেন এবং মহিলাগণ তাদের চুলের শেষ ভাগ হতে এক গিরা পরিমাণ চুল কাটবেন। তারপর ইহ্রামের কাপড় খুলে ফেলে সাধারণ পোষাক পরবেন।

৮। এরপর কাবাতে গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাযাহ্' করবেন। ৭ চক্করের মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত শৃঙ্খলার সাথে তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন।

৯। অতঃপর পুনরায় মিনা ফিরে এসে রাত্রি যাপন করবেন ও ১১ ই যিলহিজ্জাহ্ ও ১২ই যিল হিজ্জাহ্র সকালে তিনটে জামারাহ্কে পাথর মারবেন। আর যার দ্রুততা নেই তিনি ১৩ তারিখেও অবস্থান করে কাঁকর নিক্ষেপ করবেন। কুরবানীর দিনের পরবর্তী তিন দিনের কাঁকর নিক্ষেপের নিয়ম হল, দুপুরের পর প্রথমে মাসজিদে খাইফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরাহ্, অতঃপর মধ্য জামরাহ্, তারপর জামরায়ে কুবরা যাকে ঈদের দিন কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন, কাঁকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি জামরাতে কাঁকর নিক্ষেপের পর প্রাণ ভরে দুআ করবেন কিন্তু শেষেরটিতে কাঁকর নিক্ষেপের পর দাঁড়াবেন না।

১০। পরিশেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতির পূর্বে কা'বার শেষ তাওয়াফ (তাওয়াফে বিদা') বা বিদায়ের তাওয়াফ করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের ইবাদাতকে গ্রহণ করুন — আমীন।

হাজ্জের বিস্তারিত বিবরণে জন্য আব্দুল হামীদ মাদানীর 'হাজ্জ ও উমরাহ্' অবশ্যই সঙ্গে রাখুন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

পাপ মুক্তির একমাত্র উপায় তওবা

মোহাঃ কুতুবুদ্দীন

عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىِّ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طُعَامُهٗ وَ شَرَابُهٗ فَأَئِيْسَ مِنْهَا - فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا - وَ قَدْ اَئِيْسَ مِنْ رَّاحِلَتِهٖ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهٗ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا - ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَ اَنَا رَبُّكَ اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

অর্থ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবায়, যখন সে তওবা করে সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি আনন্দিত হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর আহারাদি ওর পিঠের উপর রয়ে যায়। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তার বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ফেলে — হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রব বা প্রতিপালক, সীমাহীন আনন্দের জন্য সে এই ভুল করে ফেলে (সহীহ্ বুখারী ২/৯৬৩, মুসলিম ২/৩৫৫)।

মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ইসলামী বিধানে যে সকল অনুশাসন নির্ধারণ করেছেন সেগুলির একটি হলো - কোনো অন্যায় বা পাপ করার পর তওবা তথা ক্ষমা চেয়ে সে পাপ থেকে ফিরে আসা যায়। এ ফিরে আসাটি মানব জীবনের একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিমিত্তে একটি সুপ্রশস্ত সেতুবন্ধন, একটি সহজ, সরল ও সংরক্ষিত পথ। আল্লাহ্ যদি শরীয়তে তাওবার বিধান না রাখতেন, তাহলে হয়ত অনেকের পক্ষেই মুক্তি লাভ সম্ভব হত না। শুধু তাই নয় মনের অজান্তে ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবশতঃ পাপে লিপ্ত হওয়ার পর নিঃশর্ত তওবায় সে ভাবে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র আনন্দ ও খুশী প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে এটা প্রমাণিত যে, বান্দা পাপ করবে আবার নত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে আর তিনি ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ - وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

অর্থ ঃ প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে, আর উত্তম হলো সে যে ভুল করার পর তওবা করে (তিরমিযী, মিশকাত হা/ ২৩৪১)।

বান্দা যদি পাপ না করত এবং তারপর ক্ষমা না চাইত তাহলে আল্লাহ্ মানুষকে ধ্বংস করে অন্য জাতি সৃষ্টি করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَ لَجَآءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهُ فَيُغْفَرُ لَهُمْ.

অর্থ ঃ আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যার হাতে আমার জীবন, সে মহান সত্ত্বার কসম করে বলছি, তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইত, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিতেন (মুসলিম হাঃ ২৭৪৯)।

তাওবার সংজ্ঞা ঃ তাওবা আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ ঃ অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রত্যাবর্তন। লিসানুন আরাব আভিধানে বলা হয়েছে اَلرُّجُوْعُ مِنَ الذَّنْبِ — অর্থাৎ পাপ থেকে ফিরে আসা। رَجَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ اِلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ পাপ থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

তাওবার শর্তাবলী ঃ ইমাম নববী বলেন —

قَالَ الْعَلَمَآءُ التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.

অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক পাপ থকে তওবা করা অপরিহার্য। যদি পাপের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোনো মানুষের অধিকার তথা তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরণের তওবাহ্ কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) সম্পূর্ণ পাপ পরিত্যাগ করা। (২) পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। (৩) ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সংকল্প করা। যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হবেনা। আর যদি সেই পাপ কাজ মানুষের অধিকার সম্বন্ধীয় হয়, তবে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্তটি হলো হকদারের হক ফিরিয়ে দেওয়া। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল নিয়ে নেয়, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগায়, তাহলে অপবাদী ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। যদি কারো পরচর্চায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বৈধ করে নিবে। আল্লাহ্ বান্দাকে তাওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন —

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট খাঁটি অথবা বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ করবে (সূরাহ্ তাহরীম ৬৬/৮)।

আল্লাহ্ আরো বলেন —

وَ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে তওবাহ্ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন — وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ ঃ যারা তাওবা করেনা তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত (সূরাহ্ হুজুরাত ৪৯/১১)।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন —

اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

আল্লাহ্‌র কসম! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট পাপের ক্ষমা চাই (বুখারী রিয়াযুস্ স্বলেহীন হা/১৩)।

عَنْ اَغَرَّ بْنِ يَسَارَ الْمُذَنِىِّ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاس تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِىْ الْيَوْمِ مِأَيَةَ مَرَّةٍ.

আগার ইবনে ইয়াসার মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবাহ কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। কেননা আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে তওবাহ করি (মুসলিম ২/৩৪৬)।

এছাড়াও আমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে আরো একটি শর্ত যোগ করতে পারি। সেটি হল (৫) তওবা করতে হবে সময়ে অর্থাৎ যথা সময়ে তওবা করতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّمَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ٥

অর্থ ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতি বিলম্বে তওবা করে এরাই হলো সেই সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞা। আর এমন লোকেদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমনকী যখন তাদের কারো

মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি (সূরাহ্ নিসা ৩/১৭-১৮).

পাপ করার পর সেটা প্রকাশ করে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ না করে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আজকের যুব সমাজের মধ্যে এ প্রবণতা খুব বেশি করে লক্ষ্য করা যায় যে কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হলে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড়ো করে দেখানোর জন্য জীবনের সকল প্রকার খারাপ কাজগুলি অবলীলায় বর্ণনা করতে থাকে এবং এভাবে সে তার বাহাদুরী প্রমাণ করতে চায়। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পাপ কাজ করে তার প্রকাশের ভায়বহতা সম্পর্কে কীভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সতর্ক করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا اَلْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ اَلْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ـ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ.

অর্থ ঃ আমার প্রত্যেক উম্মাতকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশকারী হল ঐ ব্যক্তি যে রাত্রে খারাপ কাজ করে অতঃপর সকাল করে। আর আল্লাহ্ সেটা গোপন রাখেন। অতঃপর সে বলে, হে অমুক আমি গত রাত্রে একাজ করেছি ঐ কাজ করেছি। অথচ তার প্রতিপালক রাতের কথা গোপনে রাখলেন আর সে সকাল করল ও তা প্রকাশ করল (বুখারী ৬০৬৯)।

অতএব প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিত তার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপ থেকে মুক্তির জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে ইখলাস সহকারে তাওবাহ্ করে সঠিকভাবে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করতে হবে। দুআ করি আল্লাহ্ যেন সেই তাওফীক দান করেন — আমীন।

আরাফার সিয়াম

আব্দুর রাকীব মাদানী

সম্মানিত দ্বীনি ভাই সকল! আমরা যখন কোনো দ্বীনি মাসআলার আলোচনা করি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এটা হবে না যে, আমি অমুক তমুককে মানবো, বরং সঠিকটা মানবো। আর যদি আমি ও আপনি অতীতে বা বর্তমানে কোনো কিছুর প্রতি আমল করে থাকি এবং গবেষণায় সেটা ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তা থেকে ফিরে আসাই আখেরাতের জন্য কল্যাণকর এবং একান্তভাবে কাম্য, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য আখেরাত। অতঃপর একথা বলা জরুরী মনে করছি যে, মানুষকে তাঁর মর্যাদানুযায়ী কথা বলা এটা শরীয়ারই বিধান, তাই ধমকসুরে কিংবা আদেশ সূচক শব্দ পরিহার করবেন; নচেৎ অভিজ্ঞতা ও দাওয়াতী নীতির আলোকে এটা প্রমাণিত তা সত্য হলেও লোক গ্রহণ করবে না।

আমাদের মূল বিষয় ঃ আরাফার সিয়াম হাজীগণের আরাফায় অবস্থান করার দিন রাখতে হবে না নিজ নিজ দেশের চন্দ্র তারিখ অনুযায়ী ৯ম যুলহিজ্জায় রাখতে হবে?

এ বিষয়ে কিছু লেখা ফাতাওয়া কিছুকাল থেকে পাচ্ছি এবং নিজেও কিছু গবেষণামূলক আরবী লেখা ইত্যাদি মোটামুটি পড়ে যা জানলাম তারই কিছুটা শেয়ার করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে।

১। গবেষকদের নিকট এটি একটি মাসআলা হাদেসা বা নতুন বিষয় যে কারণে প্রাচীন উলামাদের অভিমত আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে একেবারে কম। কিন্তু এইভাবে এই মাসআলার সম্বন্ধ প্রাচীন মাসআলার সাথে রয়েছে যে, মাসআলাটি 'ইখতিলাফে মাত্বালি ' বা চন্দ্র উদয় স্থলের ভিন্নতার একটি অংশ যা প্রাচীন বিষয়।

২। আরাফার দিনে সিয়াম পালন করার যেমন মজবুত দলীল রয়েছে তেমনি নিজ নিজ তারিখ অনুযায়ী আরাফার সিয়াম পালন করার পক্ষেও মজবুত দলীল আছে।

৩। বর্তমান যুগের সালাফী উলামাগণ উভয় পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছেন।

৪। আরাফার দিন কোন দিন? এর নির্দিষ্টকরণে উলামাগণ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম- আরাফার দিন সেই দিন যে দিন হাজীগণ মক্কায় আরাফায় অবস্থান করেন। এ মতের পক্ষে রয়েছেন সঊদী স্থায়ী উলামা পরিষদের ফাতাওয়া, শাইখ বিন বায, মাসরী দারুল

ইফতা সহ অনেকে। ২য় -আরাফার দিন হচ্ছে নিজ নিজ দেশের তারিখ অনুযায়ী নবম যিলহিজ্জা যদিও মক্কায় আরাফা আগে হোক বা পরে। এর পক্ষে রয়েছেন ইউরোপীয় ইফতা বোর্ড, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসায়মীন, ইবনু জিবরীন সহ অনেকে।

৫। আরাফার দিনে সিয়াম রাখার মূল দলীলটি হচ্ছে — (সহীহ্ মুসলিম ৬২৪)

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই সিয়ামকে আরাফার দিকে ইযাফত তথা সংযুক্ত করেছেন, যা সম্বন্ধপদ হওয়ার কারণে সেই দিনকেই বুঝায়।

আরাফার দিনে রহমত অবতরণ ও অধিক হারে পাপীকে ক্ষমা করার দিন ও সময় হাজীগণের আরাফার অবস্থান করার দিনকে বুঝায়।

এখানে আর একটি বিষয় আছে, তা হল - জগতের মানুষেরা বর্তমানে যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন এই আরাফা অবলোকন করছেন, তাই সেই দিনেই সিয়াম পালন করতে তাদের সংকোচ হয় না।

৬। নবম তারিখে সিয়াম রাখার মূল দলীলটি হচ্ছে, যিলহাজ্জ মাসের নবম তারিখকে আরাফা বলা হয়, আরাফায় সমবেত হওয়ার দিনকে নয়। এছাড়াও এই দলীলটিও মূল অবস্থানে রয়েছে —

অর্থাৎ নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কিছু স্ত্রী হতে বর্ণিত নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যিলহাজ্জ মাসের নবম তারিখে সিয়াম রাখতেন (আবু দাউদ নং ২৪৩৭, নাসাঈ ২৩৭২)।

তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, প্রযুক্তির পূর্বে লোকেরা নিজ নিজ চন্দ্র দর্শনের ভিত্তিতে নবম তারিখে সিয়াম পালন করতেন, তাই শারীয়াকে প্রযুক্তি মুখাপেক্ষী না করে সালাফমুখী করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ - প্রযুক্তি মুখাপেক্ষী আলাদা বিষয় আর শারীয়া বুঝতে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া আলাদা বিষয়। আমরা উপরোক্ত উলামাদের সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করতে পারি না যে, তারা শারীয়াকে প্রযুক্তিমুখী করে দিয়েছেন।

তাদের আর একটি বড় মন্তব্য হচ্ছে, আরাফা একটি কাল বা সময়ের নাম, স্থানের নাম নয়।

বিঃদ্রঃ- তাহলে প্রশ্ন হয় বিভিন্ন ফুকাহায়ে কিরাম ও আইম্মাগণ যখন এই বাক্য বলেন যে, অকুফে আরাফা বা আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের রুকন, তখন আপনাদের কাছে এর অর্থ কী হয়? আরাফার স্থানে অবস্থান করা না আরাফার সময়ে অবস্থান করা? উলামাগণ কোন অর্থে এই বাক্য ব্যবহার করতেন?

৭। জাহেরী দলীলের স্পষ্টতর দিকে দেখলে প্রথম মত অর্থাৎ আরাফার সিয়াম আরাফা দিবসেই হওয়া সঙ্গত মনে হয়। তাছাড়া বাস্তব চিত্রের সাথে খাপ খেয়ে যায়।

৮। ইসতিদলাল, আমলের ধারাবাহিকতা ও উম্মতের জন্য সহজতা লক্ষ্য করলে দ্বিতীয় মত অর্থাৎ নিজ নিজ চন্দ্র তারিখ অনুযায়ী ৯ম যিলহাজ্জে আরাফার সিয়াম পালন করাটাও প্রাধান্য পাবার যোগ্যতা রাখে।

৯। বিষয়টি যেহেতু মুস্তাহাব বিষয় এবং উভয় পক্ষে যেহেতু সহীহ্ দলীল রয়েছে এমনকী স্বয়ং সালাফী উলামাগণেরও উভয় পক্ষে মত রয়েছে তাই আমি উভয় আমলকে জায়েয মনে করছি। আর কেউ কোনো একটি মতকে রাজেহ মনে করলে তাকে মন্দ মনে করি না এবং এ নিয়ে দলাদলি মন্দ মনে করি। আল্লাহ্ যেন আমাকে ও আপনাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দেন ও আমাদের সৎ আমলগুলি কবুল করেন তার জন্য দুআ করি — ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আরাফার দিনে হাজীগণের করণীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য। অতঃপর নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি বর্ষিত হোক অনেক অনেক রহমত ও শান্তি ধারা।

আরাফা কী? আরাফা একটি স্থান তথা মাঠের নাম, যা মক্কা শহরের পূর্ব দিকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

মক্কা শহর থেকে আরাফা যেতে হলে প্রথমে মিনা, তারপর মুজদালিফা, অতঃপর কয়েক কিলোমিটার অতিক্রম করতঃ আরাফায় পদার্পণ করতে হয়। বর্তমানে আরাফার মাঠে বিচরণ করার জন্য পাকা রাস্তা করা হয়েছে। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি নিম গাছ লাগানো হয়েছে এবং অধিক গরমের সময় কৃত্রিম ফোয়ারার মাধ্যমে সেখানকার বায়ুমণ্ডল শীতল রাখার সুব্যবস্থা আছে।

আরাফার দিন ও সময়সীমা ঃ আরাফার দিন বলতে যিলহাজ্জ বা হজ্জের মাসের নবম তারিখকে বুঝায়। অনেকে মনে করে, সম্মানিত হাজীগণ যে দিন আরাফায় অবস্থায় করেন সে

দিনকে আরাফা বলে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর আসল সময়সীমা।

আরাফার দিনের গুরুত্ব ঃ শরীয়তে হজ্জের দিনসমূহ এবং কার্যাবলীর মধ্যে আরাফার গুরুত্ব সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের একটি রুকন তথা স্তম্ভ না করলে হজ্জ হয় না। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — الحَجُّ عَرَفَةُ অর্থাৎ 'আরাফার অবস্থান করাই হচ্ছে হজ্জ' (তিরমিযী, আবু দাউদ, সহীহুল জামে আস্ স্বগীর নং ৩১৭২)।

এই দিনে আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُوْلُ : مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ.

অর্থ ঃ আরাফার দিনের চেয়ে অধিক পরিমাণে আর অন্য কোনো দিনে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন না। তিনি সেদিন নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন, 'এরা সকলে কী চায়?' (মুসলিম / হাজ্জ নং ৩২৭৫)।

আরাফার দিনে হাজী ভাইদের করণীয় ঃ

প্রথম করণীয় ঃ নবম তারিখে সূর্যোদয়ের পর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) কিংবা তালবিয়্যাহ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ......) পাঠ করতে করতে মিনা হতে আরাফায় আগমন করা (বুখারী, মুসলিম)।

দ্বিতীয় করণীয় ঃ সম্ভব হলে আরাফার 'নামেরা' নামক স্থানে অবতরণ করা নচেৎ আরাফার মাঠের যে কোনো স্থানে অবস্থান করা (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)। বর্তমানে সউদী সরকার মিনা, মুজদালিফা এবং আরাফার শুরু ও শেষ চেনার জন্য উঁচু উঁচু সাইন বোর্ড স্থাপন করেছে। যাতে আরবী এবং ইংরেজিতে শুরু ও শেষ লিখা আছে। উক্ত সাইন বোর্ড দেখেই হাজী ভাইকে বুঝতে হবে যে, সে কোথায় আছে।

তৃতীয় করণীয় ঃ যুহরের সময় যুহ্র ও আসরের স্বলাত একত্রে এক আযান ও দুই ইক্বামতের মাধ্যমে কসর করে অর্থাৎ মুসাফিরের মত দুই দুই রাকাআত করে আদায় করা (আবু দাউদ, মানসিক নং ১৯১০, আহমাদ)।

প্রকাশ থাকে যে, এই সময় স্বলাতের পূর্বে মাসজিদে নামেরাতে ইমাম খুতবা প্রদান করবেন, অতঃপর স্বলাত আদায় করবেন। সম্ভব হলে উক্ত খুতবা শোনা ও জামাআতে স্বলাত পড়া ভাল। কারণ সাহাবাগণ নাবীজীর খুতবা শুনেছিলেন এবং তাঁর সাথে স্বলাত আদায় করেছিলেন।

চতুর্থ করণীয় ঃ হাজী ভাইদের উচিৎ হবে তারা যেন এই দিনে বেশি বেশি করে তালবিয়্যাহ পাঠ করে, যিকির করে, তাসবীহ-তাহলীলে মগ্ন থাকে এবং নিজ, নিজ পরিবার তথা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদের জন্য দুআ করে। আর অনর্থক গল্প-গুজব থেকে দূরে থাকে।

আরাফার দিনের বিশেষ দুআ ঃ এমনিতে এই দিনে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর প্রত্যেক দুআই জায়েয। তবে একটি এমন দুআ আছে যা সকল নাবীগণ করেছেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ أَفضلُ ما قلتُ أنَا و النبيون مِنْ قبلى : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

অর্থ ঃ সবচেয়ে উত্তম দুআ আরাফার দিনের দুআ। আমি ও আমার পূর্বের নাবীগণ সর্বোত্তম যেই দুআটি বলেছি (তা হলো) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু' (মুআত্তা, সূত্র হাসান, সিল্‌সিলাহ্ সহীহাহ্ নং ১৫০৩)। এই মর্মে যেই হাদীসটি তিরমিযীতে আছে সেটি যয়ীফ (দেখুন নায়লুল আউতার ৫/৮২ অধ্যায় ঃ মানাসিক)।

আরাফার দিনে সিয়াম রাখার ফযীলত ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আরাফার দিনের সিয়াম এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ''(মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাউম, আবু দাউদ, নাসাঈ)। তবে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরাফার দিনে সিয়াম রাখেননি। মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ''লোকেরা আরাফার দিনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সিয়াম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাই আমি দুধের এক পিয়ালা তাঁর কাছে পাঠায়। তিনি তা

পান করেন। আর লোকেরা তাঁর দিকে দেখতে থাকেন" (বুখারী নং ১৯৮৮-১৯৮৯)।

তাই উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, এই সিয়াম তাদের জন্য যারা হজ্জের নিয়তে আরাফায় অবস্থান করছে না। কারণ এ সকল ব্যক্তিবর্গ মুসাফির আর মুসাফির ব্যক্তির উপর ফরয সিয়ামই জরুরী নয়, তাহলে নফলের বেলায় তো আরও শিথিলতা হবে (ফাতহুল বারী ৪/৩০১)।

ইমাম শাওকানী বলেন, ''যেহেতু এই দিনে সিয়াম রাখা ও না রাখা উভয় পক্ষের দলীল এসেছে তাই এই দিনে সিয়াম রাখা মুস্তাহাব (করা ভাল, না করলে গুনাহ্ নেই) তাদের ক্ষেত্রে যারা হাজী নয়। আর সিয়াম রাখা মাকরূহ (না রাখাই ভাল) তাদের ক্ষেত্রে যে হাজী হিসাবে আরাফায় এসেছে। কারণ এই যে, হাজী ব্যক্তি সিয়াম রাখলে হতে পারে সে দুর্বল হয়ে যাবে এবং যিকির, দুআ ও হজ্জের কাজ করতে তার অসুবিধা হবে" (নায়লুল আউতার ৪/৭২৭)।

আরাফার দিনের ভুল-ভ্রান্তি ঃ

(ক) অনেকে আরাফার সীমানার খেয়াল না করে আরাফার বাইরে অবস্থান করে এবং সেখান থেকেই মুজদালিফায় চলে আসে। যে এই রকম করে তার হজ্জ হবে না। কারণ আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের রুকন (স্তম্ভ)। আর সে রুকন ছেড়ে দিল। তাই প্রত্যেক হাজী ভাইকে সতর্ক থাকা দরকার যে, সে আরাফার সীমানার ভিতরে আছে কি না?

(খ) আরাফার মাঠ সূর্য ডোবার আগেই ছেড়ে দেওয়া। এই রকম জায়েয নয়, কারণ এটা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আমলের বিপরীত।

(গ) আরাফার পাহাড়ে তথা সেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করা, সেখানে স্বলাত পড়া এবং তা বরকতের মনে করে স্পর্শ করা। এসব বিদ্আত শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই।

(ঘ) দুআর সময় আরাফার পাহাড়কে সামনে করে দুআ করা। সুন্নাত হলো কিবলার দিকে মুখ করা।

আল্লাহ্ যেন আমাদের সঠিক বিধান জানার এবং সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

৫৬তম পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ ১

মাসজিদের বিবরণ ১

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

১৯৭। মাসজিদে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তুমি মাসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে, তখন বলবে — لاَ اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ আল্লাহ্ তাআলা যেন তোমাদের ব্যবসায় উন্নতি না দেন।[১]

১৯৮। শরীআত পরিপন্থী নয় এমন কবিতা মাসজিদে পাঠ করা বৈধ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাসসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন — يَنْشُدُ فِى الْمَسْجِدِ তখন তিনি মাসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর দিকে ফিরে দেখলেন। এজন্য হাসসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন — قَدْ كُنْتُ اَنْشُدُ فِيْهِ وَ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ.

আমি সেই সময়েও কবিতা পাঠ করতাম, যখন মাসজিদে আপনার থেকে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন (অর্থাৎ আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)।[২]

১৯৯। মাসজিদ শয়ন করা বৈধ।

আব্বাস বিন তামীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের চাচার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে —

أَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اَحَدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى.

নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মাসজিদে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।[৩]

১। সহীহ্ ঃ সহীহ্ তিরমিযী ১০৬৬, কিতাবুল বুইয়ূ ঃ বাবুন নাহিয়ে আনিল বাইয়ে ফিল মাসজিদ, মিশকাত ৭৩৩, ইরওয়াউল গালীল ১৪৯৫, তিরমিযী ১৩২১, নাসায়ী ৬/৫২, ইবনু খুযাইমা ১৩০৫।

২। বুখারী ৩২১২ কিতাবু বিদইল খালকে ঃ বাবু যিকরিল মালাইকাহ্, মুসলিম ২৪৮৫, নাসায়ী ২/৪৮, আহমাদ ৫/২২২, হুমাইদী ১১০৫, ইবনু খুযাইমা ১৩০৭, বাইহাক্বী ২/৪৮৮।

৩। বুখারী ৪৭৫ কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল ইসতিলকায়ে ফিল মাসজিদে অ মাদ্দুর রিজলে, মুসলিম ২১০০, আবূ দাউদ ৪৮৬৬, তিরমিযী ২৭৬৫, নাসায়ী ২/৫০, আহমাদ ৪/৩৮।

২০০। মাসজিদে ঘুমানো বৈধ।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাসজিদে ঘুমাতেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহুম আনহুম) বলতেন — كُنَّا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ وَ نُقِيْلُ فِيْهِ وَ نَحْنُ شَابٌّ. আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে মাসজিদে ঘুমাতাম, কাইলুলাহ্ বা দুপুরে বিশ্রাম করতাম এবং আমরা নওজোয়ান ছিলাম।[১]

২০১। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মাসজিদে তাঁবু লাগানোর বিধান।

ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেছেন, প্রয়োজনে এ রকম করা বৈধ।[২] যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সাআদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আহত হয়েছিলেন — فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ.
আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মাসজিদে তাঁর জন্য তাঁবু বানিয়েছিলেন যেন কাছ থেকে তাঁর শুশ্রূষা করা যায়।[৩]

২০২। মহিলাদের মাসজিদে রাতে থাকার বিধান।

মহিলারাও মাসজিদে রাতে থাকতে পারেন এই শর্তে যে কোনো প্রকার আশংকা থাকবে না।[৪] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে — اَنَّ وَلِيْدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءً فِى الْمَسْجِدِ.
একজন কালো রঙের মেয়ের তাঁবু ছিল মাসজিদে। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার নিকটে আসত।[৫]

২০৩। মাসজিদের ভিতর কেসাস ও হুদুদ কার্যকর করা হারাম।

ইমাম শওকানী এবং ইমাম সানআনী (রহঃ) এ কথাই বলেছেন।[৬] হাকীম বিন হেযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ الْمَسْجِدِ وَ لَا يُسْتَقَادُ فِيْهَا.
মাসজিদে হুদুদও* কার্যকর করা যাবে না এবং কেসাসও** না।[৭]

---

*হুদুদ হল হাদ-এর বহুবচন। হাদ বলা হয় শারীআতে বর্ণিত অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান যেমন যেনার হাদ্দ ইত্যাদি।
** কেসাস হল অপরাধের সম পরিমাণ বদলা। যেমন হাতের বদলে হাত বা হত্যার পরিবর্তে হত্যা।

১। বুখারী ৪৪০ কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু নওমির রেজালে ফিল মাসজিদে, মুসলিম ২৪৭৯, আবূ দাউদ ৩৮২, নাসায়ী ২/৫০, আহমাদ ২/১২, ইবনু মাজাহ্ ৩৯১৯।
২। নাইলুল আওতার ১/৬৭২।
৩। বুখারী ৪৬৩ কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবুল খিমাতে ফিল মাসজিদ লিল্ মারাযে অ গাইরে হিম, মুসলিম ১৭৬৯, আবূ দাউদ ৩১০১, নাসায়ী ২/৪৫, আহমাদ ৬/৫৬।
৪। সুবুলুস সালাম ১/৩৬২।
৫। বুখারী ৪৩৯ কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু নওমিল মারআতে ফিল মাসজিদ।
৬। নাইলুল আওতার ১/৬৬৫, সুবুলুস সালাম ১/৩৫৯।
৭। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩৭৬৯, আল্ মিশকাত ৭৩৪, ইরওয়ালুল গালীল ২৩২৭, আবূ দাউদ ৪৪৯০ কিতাবুল হুদুদ ঃ বাবু ফী ইকামাতিল হাদ্দ ফিল মাসজিদ, দারাকুতনী ৩/৮৫, আহমাদ ৩/৪৩৪, বাইহাক্বী ৮/৩২৮, শাইখ হাসান কাযী হাদীসটিকে হাসান লেগাইরিহি বলেছেন — আত্ তালীক আলা সুবুলিস সালাম ১/৩৫৯, হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন যে, এর সানাদে কোনো সমস্যা নেই - তালখীসুল হাবীর ৪/৪৬।

২০৪। মাসজিদে থুতু ফেলা পাপ।

(১) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اَلْبُصَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. মাসজিদে থুতু ফেলা পাপ এবং তা দূর করাই হল এর কাফ্‌ফরা।[১]

(২) আব্দুল্লাহ্ বিন শাখীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, (তিনি বলেছেন) আমি আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে স্বলাত আদায় করেছি — فَرَاَيْتُهُ يَتَنَخَّعُ فَدَ لَّكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرٰى আমি তাঁকে কফ ফেলতে দেখেছি। অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের বাম পায়ের জুতো দিয়ে ঘষে দিলেন।[২]

(শওকানী রহঃ) — তখনই এ কাজ সঠিক, যখন মাসজিদে কোনো কিছু বিছানো থাকবে না। কিন্তু যখন মাসজিদে চাটাই বা কালীন (গদি জাতীয় আসন) বা ঐ ধরণের কোনো কিছু বিছানো থাকবে এবং থুতু দূরা কঠিন যা থুতুর কাফ্‌ফারা, তখন এ কাজ পাপের কাজ। যার কাফ্‌ফারা দেওয়া যাবে না।[৩]

২০৫। মাসজিদে সেনা প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের মহড়া করা জায়েয বা বৈধ।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখেছি যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার জন্য পর্দা করেছিলেন—

وَ أَنَا أَنْظُرُ اِلٰى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ.

আমি হাবশীদের দেখছিলাম, তারা মাসজিদে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল।[৪]

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, — يَلْعَبُوْنَ بِحَرَابِهِمْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ তারা তাদের বল্লম নিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের মাসজিদে খেলছিল।[৫] এবং সহীহ্ বুখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে —

وَ كَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانَ بِالدَّرْكِ وَ الْحَرَابِ .

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, ঈদের দিন সুইডেনের কিছু সাহাবা ঢাল ও বল্লম নিয়ে খেলছিলেন।[৬]

২০৬। মাসজিদে আহার করা বৈধ।

আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ .

আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের যুগে মাসজিদে রুটি এবং মাংস খেতাম।[৭]

১। বুখারী ৪১৫, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু কাফ্‌ফারাতিল বুসাক ফিল মাসজিদ, মুসলিম ৫৫২। (২) মুসলিম ৫৫২। (৩) আস্ সাইলুল জাররার ১/১৮২। (৪) বুখারী ৪৬৩, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল খীমাতে ফিল মাসজিদে লিল মারাযে অ গাইরিহিম, মুসলিম ৮৯২।

৫। মুসলিম ১৪৮১, কিতাবু স্বলাতিল ঈদাইন ঃ বাবুর রুখসাতে ফিল্ লা আবিল লাযি লা মাসিয়াতে ফিহী।

৬। বুখারী ২৯০৭, কিতাবুল জিহাদে অস্ সাইদ ঃ বাবুদ্ দিরক্বে।

৭। সহীহ্ ঃ সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ২৬৬৯, কিতাবুল আতইমাহ্ ঃ বাবুল আকলে ফিল মাসজিদ, সহীহ্ আবূ দাউদ ১৮৭, তামামুল মিন্নাহ্, ইবনু মাজাহ্ ৩৩০০, ইবনু হিব্বান ১৬৫৭, আহমাদ ৪/১৯০, হাফেয বূসীরি (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন-আয্ যাওয়ায়েদ ৩/৮০।

২০৭। প্রয়োজনে মুশরিক মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি ছোট সেনাবাহিনী কোনো এক দিকে প্রেরণ করলেন — فَجَائَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ.

তারা একজন লোককে গ্রেপ্তার করে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে নিয়ে এলো এবং সেই কয়েদিকে মাসজিদের একটি পিলারের সাথে বেঁধে দিলো (সেই কয়েদিটি ছিলেন সোমামা বিন আসাল-মুশরিক)।[১]

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে আগত সাকীফ এর মুশরিকদের প্রতিনিধি দলকে মাসজিদে থাকতে দেওয়াও এর দলীল।[২]

২০৮। আযানের পর মাসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান।

বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া এরকম করা জায়েয নয়। যেমন আবু শা'সা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আসরের আযানের পর মাসজিদ থেকে বের হলেন তো আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন — اَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ. এই ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিরোধিতা করলেন।[৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি মারফূ বর্ণনায় রয়েছে —

اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّىَ.

যখন তুমি মাসজিদে থাকবে এবং স্বলাতের জন্য আযান দেওয়া হবে, তখন তোমরা কেউই স্বলাত আদায় না করে মাসজিদ থেকে বের হবে না।[৪]

২০৯। মাসজিদে স্বলাতের জন্য অপেক্ষা স্বলাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلَاةُ.

তোমরা ততক্ষণ স্বলাতেই থাকো, যতক্ষণ স্বলাত তোমাদেরকে আটকে রাখে। এমনভাবে যে, পরিবারের নিকটে ফিরতে একমাত্র স্বলাতই প্রতিবন্ধক হয়।[৫]

১। বুখারী ৪৬২ কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল ইগতিসালে ইযা আসলামা, মুসলিম ৩৩১০।

২। যয়ীফ ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ ২৯৭, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু তাহযীবিল কুরআন, আবূ দাউদ ১৩৯০, ইবনু মাজাহ্ ১৩৪৫, আহমাদ ৯/১৩৪৩, শাইখ মুহাম্মাদ সাজী হাল্লাক হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, আত্ তালীক আলাস সাইলিল জাররার্ ১/৪০২।

৩। মুসলিম ৬৫৫, কিতাবুল মাসজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত ঃ বাবুন নাহীয়ে আনীল খুরুজ মিনাল মাসজিদ ইযা আয্যানাল মুআয্যিন, আবূ দাউদ ৫৩৬, তিরমিযী ২০৪, ইবনু মাজাহ্ ৭৩৩, আহমাদ ২/৪১০, ইবনু খুযাইমা ১৫০৬।

৪। আহমাদ ২/৫৩৭, ইমাম হাই সামী লিখেছেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী আল্ মাজমা ২/৮।

৫। বুখারী ৬৫৯, ৩২২৯, কিতাবুল আযান ঃ বাবু মান জালাসা ফিল মাসজিদে ইয়ানতাযিরুস্ স্বলাত অ ফাযলিল মাসজিদ, মুসলিম ৫/১৬৬, আবূ দাউদ ৪৭০, মুআত্তা ১/১৬১।

২১০। মাসজিদে মুবাহ্ কথাবার্তা এবং হাসার বিধান।

জায়েয, এতে কোনো সমস্যা নেই।[১] হাদীসে সাহাবাদের সম্পর্কে রয়েছে —

كَانُوْا يَتَحَدَّ ثُوْن فَيَاخُذُوْن فى اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَ يَتَبَسَّمُ.

সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কথা বলতেন, জাহেলিয়্যাতের কাজ করতেন এবং হাসতেন আর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মুচকি হাসতেন।[২]

২১১। কাবার ভিতরে প্রবেশ করে স্বলাত সম্পাদন করা বৈধ।[৩]

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), উসামা বিন যায়েদ, বেলাল এবং উসমান বিন তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বাইতুল্লাহ্তে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর যখন তারা দরজা খুললেন তো সর্বপ্রথম আমি প্রবেশ করলাম এবং বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করে, জিজ্ঞাসা করলাম — هَلْ صَلَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি ভেতরে স্বলাত আদায় করলেন? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন — نعم بين العَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ হ্যাঁ, দুটি ইয়ামিনী পিলারের মাঝে।[৪]

মনে রাখতে হবে যে, কাবার ভিতরে কেবল নফল স্বলাতই সম্পাদন করা যেতে পারে। কিন্তু ইমাম শওকানী এবং ইমাম আবূ হানীফা ফরয স্বলাত সম্পাদন করাকেও বৈধ বলেছেন। কেননা এটিও মাসজিদ।[৫]

২১২। কবরের মধ্যে মাসজিদ নির্মাণের বিধান।

যদি কেউ কবর স্থানে কবরের মাঝে মাসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে সেই মাসজিদ কবরের মতই। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, — كَانَ يُكْرَهُ اَنْ يُّبْنٰى مَسْجِدٌ فِىْ وَسْطِ الْقُبُوْرِ. কবরের মধ্যে মাসজিদ নির্মাণকে অপছন্দ করা হতো।[৬]

২১৩। নেকীর উদ্দেশ্যে কেবল তিনটি মাসজিদে সফর করা জায়েয।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَ مَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

কেবল তিনটি মাসজিদের জন্য সফর করা যাবেঃ মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন্ নাবী এবং মাসজিদুল আকসা।[৭]

১। বিস্তারিত জানতে দেখুন আল্ মাজমূ ২/১৭৭, আল্ মুহাল্লা ৪/২৪১, হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/৪৪৫।

২। তাবারানী কাবির অল আওসাত কামা ফিল মাজমূ ২/২৪, ইবনু আসাকির ফী তরীখে দেমাস্ক ১২/৩৯/২।

৩। বিস্তারিত জানতে দেখুন ফাত্হুল বারী ২/৫৮, শারাহ্ মুসলিম লিন্ নওয়াবী ৫/৯৬।

৪। বুখারী ৪৬৮, ৫০৪, ৫০৫, ১৫৯৯ কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবুস্ স্বলাতে বাইনাস সওয়ারী ফী গাইরে জামাআতিন, মুসলিম ১৩২৯, আবূ দাউদ ২০২৩, ইবনু মাজাহ্ ৩০৬৩, নাসায়ী ২/৬৩, মুআত্তা ১/৩৯৮, আহমাদ ২/৩৩, দারেমী ২/৫৩, ইবনু খুযাইমা ৩০০৯।

৫। আল্ মুগনী লে ইবনে কুদামা ২/৪৭৫-৪৭৬। (৬) আল্ মুগনী ৪৭৫৩২।

৭। বুখারী ২১৮৯ কিতাবু ফাযলিস স্বলাত ফী মাসজিদে মাক্কাতা অল মাদীনা ঃ বাবু ফাযলিস স্বলাত ফী মাসজিদে মাক্কাতা অল মাদীনাহ্।

৩য় পর্ব

ইসলামের কতিপয় মৌলিক নীতি

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্ তামীমী
অনুবাদ ও সংযোজনে ঃ আব্দুর রহমান

(৫) হাজ্জ-এর দলীল ঃ আর হাজ্জ-এর দলীল হল নিম্নলিখিত আয়াতটি —

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তাআলা জগতসমূহের প্রতি অমুখাপেক্ষী (সূরাহ্ আলে ইমরান ৩/৯৭)।

ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান লাভ করা অর্থ হল — তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আদেশ পালন করার মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করা এবং যাবতীয় শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করা। এর দ্বিতীয় ধাপটি হল ঈমান। ঈমানের সত্তরের (৭০) অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। আর সবচেয়ে নিম্নস্তরের শাখা হল কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা হল ঈমানের অন্যতম একটি শাখা। হাদীসটি হল —

الايمان بضع و سبعون سعبة أفضلها لا اله الا اله الا اللّه و اماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان.

(আল্ হাদীস বুখারী নং ৪, মুসলিম নং ৫৪)

ঈমানের ছয়টি রুকুন আছে।

১ম রুকুন ঃ (১) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান। (২) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। (৩) সমস্ত ঐশী গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান। (৪) তাঁর সমস্ত রসূলগণের প্রতি ঈমান। (৫) কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এবং (৬) তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান।

ঈমানের এই ছয়টি রুকুন দলীল দ্বারা প্রমাণিত। ১ নং রুকুন থেকে ৫ নং রুকুনের কুরআনী দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ.

অর্থ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নাবীগণকে বিশ্বাস করলে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৭৭)।

প্রিয় পাঠক! অত্র আয়াতে লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন এখানে ঈমানের পাঁচটি রুকুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, শেষ বিচার দিবস, পুনরুত্থান এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করা। 'কিতাব' বলতে সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনা। ফিরিশতাদের অস্তিত্ব ও সকল নাবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা (তাফসীর আহসানুল বায়ান ৫৩ পৃঃ দ্রঃ)।

ঈমানের ৬ নং রুকুন তাকদীর ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন — ''নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তাদের ব্যাপারে জানতেন এবং সেই জানার আলোকে তিনি তাদের সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দেন'' (সূরাহ্ কামার ৪৯, ইবনে কাসীর, আহসানুল বায়ান)।

তৃতীয় ধাপ বা স্তর হল — ইহ্সান। ইহ্সান-এর রুকুন একটিই। ইহ্সান বলতে বোঝায় — মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার সময় এমনভাবে ইবাদাত করতে হবে যেন ইবাদাতকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই দেখতে পাচ্ছে অথবা এরূপ মনে করবে যে তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছনা ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এই মর্মে একটি হাদীস হল —

প্রথম দলীল ঃ আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

ان تعبد اللّه كانّك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.

অর্থঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাত এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন (মিশকাত)।

দ্বিতীয় দলীল - কুরআন থেকেঃ মহান আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّـقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা তাকওয়া (সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করে চলে) অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ (সূরাহ্ নাহাল ১৬/১২৮)।

ইহ্সান-এর তৃতীয় দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٥ وَ تَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ٥ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থঃ তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর। যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দণ্ডায়মান হও (স্বলাতে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরাহ্ শুআরা ২১৭-২২০)।

চতুর্থ দলীল ঃ অপর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন—

وَ مَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ.

অর্থঃ তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ করো না কেন এবং তোমরা যে কাজই করো না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি পরিদর্শক হই (সূরাহ্ ইউনুস ১০/৬১)।

রসূলে আরাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পবিত্র সুন্নাত থেকে এই মর্মে দলীল হিসাবে সুবিখ্যাত ঐ হাদীসটিকে তুলে ধরা সমীচিন মনে করছি, যেটি হাদীসে জিব্রীল নামে পরিচিত। হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পবিত্র সংস্পর্শে বসেছিলাম। হঠাৎ সেখানে এক ব্যক্তির আগমন ঘটলো। তার পরিধেয় বস্তু ছিল অত্যন্ত ধপধপে সাদা, আর চুলগুলো ছিল কুচকুচে কালো, সফরের কোনো ছাপ তার অঙ্গে ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতও না। সে ব্যক্তি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এসে বসে পড়লো এবং তার হাঁটু দুটো রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাঁটুতে মিলিয়ে (ঠেকিয়ে) এবং তার দু হাতখানা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উরুর উপর রেখে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সে বলল, ওহে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন —

ان تشهد أن لا اله الا اللّٰهُ و ان محمدًا رسول الله و تقيم الصلوٰة و تؤتى الزكوٰة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا.

অর্থ ঃ এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল এবং স্বলাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দাও আর রমাযান মাসের সিয়াম পালন কর আর যদি কাবা পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ থাকে তবে হজ্জ কর। ওই ব্যক্তি বলল — আপনি সঠিক বলেছেন।

(রাবী বলছেন) আমরা সকলে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ সে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং সেই তার সত্যায়ণও করেছে। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাকে ঈমান সম্বন্ধে বলুন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন —

ان تؤمن باللّٰهِ و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شرّه.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর সকল ফেরেশতাদের প্রতি সমস্ত ঐশীগ্রন্থের প্রতি , তাঁর সমস্ত রসূলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং তাকদীদের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।

সেই ব্যক্তি আবারও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রশ্ন করল, 'ইহ্সান' কী আমাকে বলুন? তার উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন —

ان تعبد الله كانّك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.

অর্থঃ আল্লাহ্র ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে মনে করবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন। অতঃপর লোকটি আবার

প্রশ্ন করলো — আপনি আমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে বলুন? নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে বললেন —

ما المسئُولُ عنها باعلم من السائل.

অর্থঃ যাকে তুমি প্রশ্ন করছো তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিয়ামাতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন? তার উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন —

ان تلد الأمةُ رَبَتَهَا و اَن ترى الحفاةَ العراة العالةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتطاولون فى البنيانِ.

অর্থঃ কিয়ামতের নিদর্শন হল যে, দাসী তার মালিককে জন্ম দেবে এবং দেখবে (বর্তমানের) উলঙ্গ দেহ, উলঙ্গ পা, নিঃস্ব ছাগলের রাখালদেরকে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ করছে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী বলছেন যে, এরপর সে ব্যক্তি চলে গেলেন। তারপর আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। অতঃপর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, হে উমার! তুমি কি জান প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিলেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তিনি ছিলেন জিবরীল (আলাইহিস্ সালালম) তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

তৃতীয় মূল নীতিঃ আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পরিচিতি লাভ করা। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ছিলেন —

محمد بن عبد اللّٰه بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم بن قريش و القريش العرب و العرب بن اسماعيل بن ابراهيم.

অর্থঃ তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ছিলেন, হাশিম-এর পুত্র আব্দুল মুত্তালিব-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। হাশিম ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। আর কুরাইশরা ছিল আরবের লোক। আর আরবের লোকেরা ছিল ইব্রাহিম খালিলুল্লাহ্ (আলাইহিস্ সালাম) এর পুত্র ইসমাঈলের বংশধর।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মোট ৬৩ বছর বেঁচে ছিলেন। নবুয়ত লাভের পূর্বে চল্লিশ বছর, বাকি তেইশ বছর হল তাঁর নবুয়তী জীবন। তাঁর নবুয়তী জীবনের সূচনা হয়েছিল **اقرأ** শব্দ দিয়ে। আর রেসালাতের জীবন শুরু হয়েছিল **يا ايها المدثر** দিয়ে। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অধুনা মক্কা শহরের অধিবাসী ছিলেন। মহান আল্লাহ্ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে শিরকের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রেসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর মানুষকে তাওহীদের তথা একত্ববাদের দাওয়াত দেন। এ বিষয়ের কুরআনী দলীল নিম্নরূপ। মহান আল্লাহ্ বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٥ قُمْ فَاَنْذِرْ ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٥ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٥ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥ وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ٥ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٥

অর্থঃ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ সর্তক করো এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো আর অপবিত্রতা বর্জন করো। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো (সূরাহ্ মুদ্দাস্‌সির ১-৭ আয়াত)।

قم فانذر এর অর্থ হল- হে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি বিছানা পরিত্যাগ করুন এবং লোকেদেরকে শিরক করা হতে সাবধান ও সর্তক করুন আর তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিন। অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা কারও ইবাদাত করবেনা। সাবধান সতর্ক করা সত্বেও যদি তোমরা শিরক করো তাহলে তোমরাই বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারণ শিরকের পাপ সবচেয়ে বড় পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেন — **ان الشرك لظلم عظيم.** অর্থাৎ নিশ্চয় শিরক মহা পাপ (সূরাহ্ লুকামান)। আর তার পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

من يشرك باللّٰهِ فقد حرَّم الله عليه الجَنَّةَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ এর ভাবার্থ হল — তাওহীদ তথা

একত্ববাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা ও গরিমার কথা প্রচার করা।

و ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর অর্থ হল - নিজের সৎকর্মসমূহকে যাবতীয় শিরক থেকে পবিত্র করো।

و الرجز فاهجر এর অর্থ হল - মূর্তি পূজা এবং মূর্তি পূজকদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং এর দ্বারা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সম্বোধন করা হলেও এই আদেশ উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর প্রযোজ্য।

রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উক্ত বিষয়েই দীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত 'তাওহীদ' তথা একত্ববাদের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকেন। তার দশ বছর পর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর 'মেরাজ' গমনের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এর সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ফরয করা হয় এবং তিনি মক্কাতে তিন বছর পর্যন্ত স্বলাত আদায় করতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। আর হিজরত করা এই উম্মাতের জন্য ফরয। মূর্তিপূজারিদের দেশ পরিত্যাগ করে ইসলামিক দেশে হিজরত করার আদেশ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ আছে। এর দলীল নিম্নের আয়াতটি। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ০ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ০ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ০

অর্থঃ যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, ' তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলনা?' এদেরই আবাস স্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস। তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারেনা এবং কোনো পথ পায় না (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল (সূরাহ্ নিসা ৪/৯৭-৯৯)।

অপর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন —

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ.

অর্থঃ হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা করো (সূরাহ্ আনকাবুত ৫৬ আয়াত)।

অত্র আয়াতে এমন জায়গা থেকে হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা দুঃসাধ্য হয়। যেমন মুসলিমগণ প্রথমে মক্কা থেকে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেছিলেন (তাফসীর আহসানুল বায়ান ৭৮৩-৭৮৪)।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতটি ঐ সকল মুসলিমদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা হিজরত না করে মক্কায় অবস্থায় করছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছেন।

সুন্নাতে নবাবী থেকে হিজরতের দলীল পেশ করা হল—

لا تنقطع الهجرة حتّٰى تنقطع التوبة و لا تنقطع التوبةُ حتّٰى تطلع الشمسُ من مغربها.

অর্থঃ হিজরত ততদিন পর্যন্ত শেষ হবে না যতদিন পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা আছে। আর তওবার দরজা ততদিন পর্যন্ত খোলা থাকবে যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিমদিক থেকে উদয় না হবে (আহমাদ ৪/৭৭ সহীহ্, আবূ দাউদ নং ২৪৭৯)।

অতঃপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মদীনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন ইসলামের অন্যান্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন — যাকাত, রোযা, হজ্জ, আযান, জিহাদ, বিভিন্ন কল্যাণকর (ভালো) কাজের আদেশ ও মন্দ তথা যাবতীয় অপকর্ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিষেধ সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ

পরবর্তী অংশ ৩৬ পাতায়

কুরআনের ছোঁয়া

আলমগীর সর্দার

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মানুষের জ্ঞান সীমিত। সীমিত বা অপরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে লব্ধ জ্ঞান দিয়ে অনাদি অনন্ত অসীম জ্ঞানের অধিকারী স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তারপরও বহু মানুষ নিজ জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টাকে খুঁজতে গিয়ে পথভ্রান্ত এবং দিশেহারা হয়ে কেউবা চন্দ্রকে, কেউবা সূর্যকে, কেউবা অগ্নিকে, কেউবা পাহাড়ের পাথরকে পূজিত দেবতা ভেবে তাদের কাছে মাতা নত করেছে। নিজ জ্ঞান দিয়ে স্পষ্টাকে খুঁজতে গিয়ে কেউবা নিরীশ্বরবাদী, কেউবা বহুশ্বরবাদী, কেউবা সর্বেশ্বরবাদী হয়েছে। স্রষ্টার অজস্র সৃষ্টিকেই তারা এভাবে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছে। যার ফলে পৃথিবী জুড়ে ফিতনা ফাসাদ আর নৈরাজ্য ছেয়ে গেছে। ''সৃষ্টি যার গাইড লাইন ও তার'' এটাই মৌলনীতি হওয়া উচিত ছিল। এ নীতি আমরাও মানি। মানি; তবে শুধুমাত্র মানুষ যেটা সৃষ্টি করেছে তার ক্ষেত্রে মানি। কিন্তু! মানুষের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা অধিকাংশ মানিনা। অবাক করার বিষয়; মানুষ দ্বারা সৃষ্টিকৃত বস্তুর স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের স্রষ্টাকে অধিকাংশ মানুষই খুঁজে পায় না। যেজন্য অনেকে মাটি, গাছ, পাথর এগুলিকে স্রষ্টার আসনে বসায়। প্রকৃত অর্থে এসব জড় পদার্থ মানুষের স্রষ্টা হতেই পারে না।

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে স্রষ্টাকে চেনা, জানা ও মানার উপায় কী ?

উপায় হলো, স্রষ্টা তাঁর নিজ দায়িত্বে তাঁর পরিচয় পরিচিতি তুলে ধরবেন এবং বিধিমালা আরোপ করবেন। আর তা যদি তিনি না করেন, তাহলে একদিকে যেমন মানুষ বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়বেন, অপরদিকে স্রষ্টার দায়িত্ব পালন না করার কারণে স্রষ্টা তাঁর নিজ অস্তিত্ব হারাবেন। সুতরাং যিনি স্রষ্টা হবেন তিনি সুনিপুণভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকৃত সত্য হল স্রষ্টা তাঁর নিজ দায়িত্বে আবহমানকাল ধরে এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এ দায়িত্ব পালন করার নিমিত্তে মহান রব্বুল আলামিন পৃথিবী নামক এ গ্রহে মানুষ পাঠানোর ঊষালগ্ন থেকে মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য যুগে যুগে কালে কালে নাবী বা রসূলদের প্রেরণ করেছেন। আবহমানকাল থেকে এ ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। নাবী বা রসূল তিনি তাদেরকেই মনোনীত করেছেন যাঁরা সমসাময়িক মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ। চূড়ান্ত এবং শেষ রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে। তিনি নিজে বলেছেন, মানুষের হেদায়েতের জন্য পৃথিবী নামক এ গ্রহে আর কোনো নাবী বা রসূলের প্রেরণ করবেন না। অর্থাৎ হেদায়েতের দীপ্ত মশাল অহী দিয়ে তিনি আর কাউকে ধন্য করবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত এ আলোকবর্তিকা এ উম্মতের জন্য চূড়ান্ত এবং শেষ। অহী হিসাবে আল্ কুরআন এবং নাবী হিসাবে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নবুঅত-ই চূড়ান্ত।

তাকে পাঠানো হয়েছিল জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত এক নাজুক অবস্থার মধ্যে। চারিদিকে যখন অন্যায় -অবিচার, দুর্নীতি-দুরাচার, চুরি-ডাকাতি, খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি-মদ জুয়া-ব্যভিচার মহামারীর আকার ধারণ করেছিলো। এমনকী সামাজিক রাজনৈতিক চারিত্রিক সর্বদিকে বর্বরতার অতলতলে তলিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ মারামারি-খুনাখুনি এগুলো ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। নারীদের কোনো সম্ভ্রম ছিল না, জীবন্ত প্রোথিত করা হতো তাদেরকে। এমনকী ভোগপণ্য হিসাবে একসাথে বহু পুরুষের দেহের খোরাক হতো তারা। নারী-পুরুষ উভয়ে উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ করা ছিলো তাদের কাছে পুণ্যের কাজ। এমনি এক অরাজকতাপূর্ণ মুহূর্তে হেরা গুহার পাদদেশে নিরালায় নিভৃতে নির্জন পরিবেশে অহীর চূড়ান্ত দীপ্ত মশাল আল্ কুরআন সাথে দিয়ে মালাইকা সরদার জিবরীল আমীন প্রেরিত হলেন। ধন্য করলেন নাবী মুহামাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে। সেইসাথে এ উম্মতে মোহাম্মাদীকে। এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে চন্দ্র বছর হিসাবে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে। আর তার মেয়াদকাল ছিল মাত্র ২৩ বছর। এই স্বল্প মেয়াদকাল হলো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত, পর্যালোচিত অধ্যায়। অহীর সূচনাতেই একদিকে ছিল সংঘাতের প্রতিধ্বনি। আর, অন্যদিকে ছিলো শান্ত্বনা আর আশার বাণী।

১৪২৭ বছর আগে যখন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরবদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন, তখন তা শুনে আরবদের দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া হতো —

প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত শুনে একশ্রেণির মানুষ বললো; কী অসাধারণ কথা। এভাবে তো আমরা কখনোই ভেবে দেখিনি। তারা চিন্তা করে দেখলো, কী অসাধারণ বাক্য, সুবিন্যস্ত শব্দ, সুউচ্চ ভাষা নির্বাচন। এমন মাধুর্যপূর্ণ বাচনভঙ্গিতে উপস্থাপনা আমাদের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা করতে

পারেনা। এতো কঠিন বাণী এমন হৃদয় স্পর্শী করে কেউ কোনোদিন বলতেও পারেনি। এত সুন্দর ভাষা বিন্যাস তো মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়, এত তথ্য-তত্বে ভরা তাত্ত্বিক ব্যাপার যা মানুষের কল্পনারও বাইরে সুতরাং এটা মানুষের কথা হতেই পারে না, এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌.....।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে এক শ্রেণির মানুষ বললো এটা নিশ্চয়ই যাদু। কেউবা বললো এমন কথা তো মানুষের হতে পারে না, সুতরাং এটা হয়তো জ্বীনদের কথা, কেউবা বললো শয়তান মুহাম্মাদের উপর ভর করেছে, সুতরাং এটা শয়তানের কথা। কেউবা বললো এই জিনিস তো মানুষের পক্ষে বানানো সম্ভবই না, সত্য সত্য এটা কোনো ঐশ্বরিক বাণী। কিন্তু যদি মেনে নিই তাহলে আমি তো আর মদ খেতে পারব না, জুয়া খেলতে পারব না, যিনা করতে পারবো না, ব্যভিচার করতে পারবো না, এমনকী যা ইচ্ছা তাই করতে পারব না। শুধু তাই নয়, এগুলো যদি মেনে নিই, তাহলে সমাজে আমার যে মান-সম্মান প্রতিপত্তি ছিলো তা ভূলুণ্ঠিত হবে। কেউবা ভাবলো আমি তার কথা মেনে নিলে সমাজপতিরা আমাকে সমাজ চ্যুত করবে। তাই যেভাবেই হোক এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা .... লোকণাকে উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়বো .....।

কুরআনের কথা শুনে তদানিন্তন সমাজ আড়াআড়িভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হলো ঈমানদার আর একদল হলো নাফরমান। যারা কুরআনের ছায়ায় আশ্রিত হলো তাদের উপরে চলল জুলুম অত্যাচারের স্টিম রোলার। সে অত্যাচারের করুণ কাহিনী বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দেবে। শত অত্যাচার সহ্য করেও যারা কুরআনের ছায়াতলে থাকলো তারা পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচিত হলো। আর যারা এর বিপরীত থাকলো তাদের ইতিহাস কলংকিত হয়েই থাকল।

এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন পড়ে কি আপনার এরকম কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে? হয়নি। কারণ, আপনি কুরআন বোঝেননি। বোঝার চেষ্টাও করেন নি। হয়তো বা কখনো কোনও বাংলা অনুবাদ পড়েছেন। কিন্তু, মনে রাখা ভালো যে, কোনো অনুবাদ আল্লাহ্‌র ভাষার গাম্ভীর্যতা, অলৌকিকতা ও তার মর্যাদা তুলে ধরতে পারে না। কুরআনকে তিনি যদি বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ করতেন, তাহলে আমরা একটা একটা করে বাক্য শুনতাম, আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তাম। পৃথিবীর কোনো বাংলাভাষী কবি সাহিত্যিক কুরআনের ভাষা শৈলীতার নাগপাশ পেতেন না। আর তখন অন্য ভাষাভাষী মানুষ বাংলায় সেই বাণী শুনত, আর হাই তুলতো। ঠিন যেমন আমরা করি। আমরা অনেকেই যখন কুরআনে বর্ণিত ইয়াতীম সম্পর্কিত আরবী আয়াত তেলাওয়াত করি, তখন হয়তো আমরা এতিমের ধন সম্পদ গোগ্রাসে ভক্ষণ করি, বা তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিই। স্বলাতে দাঁড়িয়ে যখন ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলি, তখন হয়তো আমরা অনেকেই সুদের কারবার নিয়ে ভাবি। যখন হয়তো যিনার ভয়াবহ শাস্তির কথা পড়ি, তখন হয়তো অন্য কোনো সুন্দীর সুশ্রী তরুণী তন্বী নারীর বিভঙ্গে বিভোর থাকি। যখন হয়তো কিয়ামত বা জাহান্নামের ভয়াবহ বর্ণনা পড়ি তখন হয়তো দুনিয়ার প্রেমে মশগুল থাকি। বুঝিনা তো কিছুই।

কিন্তু ঐ সমস্ত লোক যারা কুরআন পেয়ে ঈমানদার হবার সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হয়েছেন। অর্থাৎ সাহাবীদের জীবনী যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব কুরআনের ছোঁয়া তাদের কী ধরণের পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, যারা মদ খাওয়াকে পানি পান করা মনে করত, মদ ছাড়া যাদের জীবন অচল ছিল। কিন্তু কুরআন যখন মদকে হারাম ঘোষণা করলো, ইতিহাস সাক্ষী বহন করে যে মদীনাতে সেদিন মদের নহর বয়ে গেল। অনেকে দূরপ্রান্ত থেকে যখন মদ হারাম করার কথা শুনলেন, সে অবস্থায় মদ খাবার জন্য যারা গ্লাস মুখে নিয়েছিলেন তারা তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যে পাত্রে মদ ছিল সে পাত্র ভেঙে দিলেন। যারা সামান্য খেয়েছিলেন তারা মুখে আঙ্গুল দিয়ে মদকে উগরে দিলেন।

ওই সমাজ যেখানে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় পরিপূর্ণ ছিল। একজন নারীকে বহু পুরুষ সম্ভোগ করতো, আর নারীরাও তাদেরকে সহজলভ্য করে তুলেছিল। নারীদের লজ্জা শরম বলে কিছুই ছিলনা এমতাবস্থায় কুরআনে যখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো, তখন যে সমস্ত নারীদের কাছে পর্দা করার মতো কাপড় ছিল না তারা তাদের পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে ওড়না বানিয়েছিল।

কুরআনে যখন যিনাকে হারাম ঘোষণা করা হলো, শুধু হারাম ঘোষণা নয় সাথে সাথে যিনাকারীদের যিনার সাজা হিসাবে রজম করার বিধান নাযিল হলো। ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা পৃথিবীর সমস্ত আলোকে ফাঁকি দিয়ে যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে রজমের সাজাকে মাথা পেতে নিলো।

যারা চুরি ডাকাতি লুটপাট রাহাজানি করে অর্থের পাহাড়

জমাতো। কুরআনের শিক্ষা তাদেরকে পৃথিবীর ধন-সম্পদ সম্পর্কে এত অনাগ্রহী করে তুলল যে তা থেকে তারা শতযোজন শুধু দূরেই থাকলো না, সংসার চালিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত পয়সা হাতে আসলে সেটাকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করলো না। একদা তালাহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘরে আসলে চেহারায় চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখলেন তার স্ত্রী। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমার কাছে কিছু অর্থ জমা হয়ে গেছে, এজন্য আমি চিন্তা করছি স্ত্রী বলল, তাতে চিন্তিত হবার কী আছে? সাথে সাথে স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে লোকদেরকে ডেকে তাদের জমাকৃত চার লক্ষ দিরহাম লোকদের মাঝে বন্টন করে দিল। শুধু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নয়, আবু তালহা একদিন তিনি নিজর সুন্দর মনোরম পূর্ণ আঙ্গুর ও খেজুর বাগানে স্বলাতরত অবস্থায় কয় রাকাআত স্বলাত পড়েছেন, তা তিনি ভুলে গেলেন। এ ভুলের কারণ হিসাবে তিনি বাগানের প্রতি মহব্বতকে প্রাধান্য দিলেন। স্বলাত শেষে তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সান্নিধ্যে গিয়ে স্বলাতে অন্য মনস্কতার কথা তুলে ধরলেন। কারণ হিসাবে তিনি বাগানের মহব্বতকেই প্রাধান্য দিলেন এবং সাথে সাথে তিনি সমুদয় বাগান দান করে দিলেন।

বছর বছর ধরে যারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত, অপরের তাজা রক্ত ঝরানো যাদের মজ্জাগত স্বভাব ছিলো, যারা রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঈমান আনার পর তাদের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। তাই তো দেখতে পাই।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে কতিপয় সাহাবা প্রচণ্ড তাপে দগ্ধীভূত হয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণে পানির জন্য কাতরাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন মুসলিম সাথী পানি পান করাতে এগিয়ে আসলেন। তিনি প্রথম জনকে পানি পান করাতে গেলে একটু দূরে অস্পষ্ট কণ্ঠে দ্বিতীয় জন পানি চেয়ে বসলেন। প্রথম জন পানি পান না করে দ্বিতীয় জনের দিকে এগিয়ে দিলেন। একই অবস্থায় দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের কাছে পাঠালেন। পানি পরিবেশনকারী সাহাবা তখন তৃতীয় জনের নিকট পানি নিয়ে পৌঁছে গেল। তৃতীয় জন প্রথম জনের কাছে পুনরায় পাঠালেন, ইতিমধ্যেই প্রথম ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেলেন। যখন সে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গেলেন তিনিও ততক্ষণে মালিকের ডাকে সাড়া দিলেন। আর যখন তৃতীয় জনের কাছে গেলেন তিনিও পানি পান না করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন।

তারা ভেবেছিলেন, তাদের জীবনের শত প্রলোভন, কামনা, বাসনা, রাগ, ঘৃণা, অহংকার থেকে নিজেদেরকে সংযত রেখে যদি এ জীবন পার করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য স্থান জান্নাতে পৌঁছে যাবো।

এগুলো ইসলামের আদিগন্ত বিস্তৃত বাগানের কয়েকটি ফুল কিংবা কয়েকটি পাপড়িমাত্র। যারা কুরআন পেয়ে ধন্য হলো তাদের ইতিহাস সুবিস্তৃত। এমন শত শত দুরাচারী ব্যক্তিরা ঈমান এনে সাহাবী হবার সাথে সাথে দুনিয়ায় থেকেও জান্নাতের কুঞ্জবনের সুসংবাদ পেয়ে ধন্য হলো। আজও এমন অসংখ্য মানুষ পাওয়া যাবে যারা কুরআনের অমীয় সুধা পান করে নিজেদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল কুরআন আপনাকে আমাকে কোনো পরিবর্তন করতে পারল না।

তাই কবি দুঃখ করে বলেছেন —

স্বলাত পড়েছ, পড়েছ কুরআন, সিয়ামও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি?
ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি।

কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) এর মর্যাদা বেড়েছে। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শ্রেষ্ঠ নাবী হয়েছেন। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়েছেন। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে রমাযান মাসের মর্যাদা বেড়েছে। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে রাতের মর্যাদা বেড়ে লাইলাতুল কদর হয়েছে। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে কাঠের মর্যাদা বেড়েছে। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে কাপড়ের মর্যাদা বেড়েছে। কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে কাগজের মর্যাদা বেড়েছে।

হায় মুসলিম! ভেবে দেখো কুরআন পেয়ে তোমার মর্যাদা কতটুকু বেড়েছে?

কুরআনের শক্তি অপরিসীম। মানুষকে সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে দেশের শাসকরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। তারপরও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কিন্তু কোনো মানুষ যদি কুরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তিনি শুধু মানুষ নয়, মহামানুষে পরিণত হয়ে যায়। কবি চলমান মুসলিমদের অবস্থা দেখে একথা বলতে বাধ্য হলেন যে —

শক্তি সিন্ধু মাঝে বসি শক্তি পেলনা যে,
মরিবার বহু পূর্বে মরিয়া গিয়াছে সে।

সহীহ্ সুন্নাহ্র আলোকে নফল সিয়াম

আব্দুল হাসীব বিন আবুল কাসিম

নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে নফল সিয়াম অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। বিভিন্ন সময়ের নফল সিয়ামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সিয়ামের ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

আবূ সাইদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ২৮৪৩, মুসলিম হাঃ ১১৫৮, নাসাঈ হাঃ ২২৪৫, সহীহ্ আল জামি ৬৩২৯, দারেমী ২৪৪৪)।

শাবান মাসের সিয়াম ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শাবান মাসে একটানা নফল সিয়াম আদায় করতেন, এ ব্যাপারে সহীহ্ বুখারী ও নাসাঈ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে —

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَ مَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ.

আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে রমাযান ব্যতীত কোনো পুরো মাসের সিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে কোনো মাসে বেশি নফল সিয়াম পালন করতে দেখিনি (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৮৪৫, মিশকাত হাঃ ২০৩৬)।

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে —

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শাবান মাসের চেয়ে অধিক সিয়াম কোনো মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শাবান মাসই সিয়াম পালন করতেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৭০)।

উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلَّا شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ.

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে শাবান ও রমাযান ব্যতীত ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি (তিরমিযী হাঃ ৬৩৬, হাদীসের মান সহীহ্)।

শাবান মাসের কয়েকদিন ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্য সিয়াম পালন করা খাস ছিল কিন্তু উম্মাতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পছন্দ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتّٰى يَجِىَ رَمَضَانُ.

অর্থাৎ শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রমাযান না আসা পর্যন্ত আর কোনো সিয়াম নেই (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৬৫১, সনদ সহীহ্)। অবশ্যই যদি কেউ অভ্যস্ত হোন বা মানত করে থাকেন তাঁরা শেষের দিকেও সিয়াম পালন করবেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৭৩)।

শাওয়াল মাসের সিয়াম ঃ রমাযান মাসের পরেই আরবী অন্যতম একটি মাসের নাম হলো শাওয়াল। শাওয়াল মাসের সিয়াম পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নফল ইবাদাত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَـنْ صَـامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমাযানের সিয়াম পালন করেছে এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল সিয়াম পালন করেছে সে যেন পুরো বছর সিয়াম রাখল (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৪৯, তিরমিযী হাঃ ৭৫৯)।

যিলহাজ্জের সিয়াম ঃ যিলহাজ্জের প্রতম দশকের সিয়াম সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِىْ الْعَشْرَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَ لَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَ لَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ

আল্লাহ্র নিকট যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় নেক আমল আর নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, না আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয়, তবে যে ব্যক্তি তার জান মাল নিয়ে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি (তার ভাল আমলের চেয়েও এ অংশ গ্রহণ ও শাহাদাত বেশি মর্যাদাপূর্ণ) (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৭২৭, হাদীস সহীহ্)।

আরাফার সিয়াম ঃ আরাফার সিয়াম সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

صِيَـامُ يَـوْمِ عَرَفَةَ اِنِّى اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السُّنَّةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ.

আরাফার দিনের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা রাখছি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ্ মার্জনা করে দেবেন (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৪৬, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৭৩০, হাদীস সহীহ্)।

প্রকাশ থাকে যে, আরাফার সিয়াম আরাফার দিনে রাখতে হবে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে। উক্ত সিয়াম রাখার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়নি এবং তারিখের উপর ভিত্তি করেও নয়। বিভিন্ন দেশে তারিখের বিভিন্নতা চাঁদের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। তাই নিজ নিজ দেশের নয় তারিখে আরাফার সিয়াম রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু হাদীসের শব্দ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ অর্থাৎ আরাফার দিনের সিয়াম। অতএব আরাফার দিনেই আরাফার সিয়াম রাখা যুক্তি সঙ্গত।

আশুরার সিয়াম ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, রমাযান মাসের সিয়ামের পরে উত্তম সিয়াম হল আল্লাহ্র মাস মুহার্‌রাম মাসের আসুরার সিয়াম আর ফরয স্বলাতের পরে সর্বোত্তম স্বলাত হলো রাতের স্বলাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১১৬৩, আবূ দাউদ হাঃ ২৪২৯)।

অন্য হাদীসে এসেছে —

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ هٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সওম পালনের ক্ষেত্রে আশূরার দিনের সিয়াম ছাড়া অন্য কোনো দিনের সওমকে এবং এ মাস (অর্থাৎ) রমাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসের সওমকে অধিক মর্যাদা দিতে দেখিনি (সহীহ্ বুখারী হাঃ ২০০৬, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১১৩২)।

২য় হিজরীর শাবান মাসে যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রথমে আশুরার সিয়াম পালনের আদেশ দেন। পরে যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হয় তখন আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেওয়া হল। যার ইচ্ছা সে পালন করত যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত (সহীহ্ বুখারী হাঃ ২০০২, ২/৩৭৬ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ وَ صُوْمُوْا قَبْلَهٗ يَوْمًا اَوْ بَعْدَه يَوْمًا.

অর্থাৎ তোমরা আশুরার সিয়াম রাখো এবং ইহুদীদের বিপরীত করো। তোমরা আশুরার সঙ্গে তার আগে একদিন অথবা পরে একদিন সিয়াম পালন করো (বায়হাক্বী ৪/২৮৭ পৃষ্ঠা)।

হাদীসের ভাষায় বুঝা যায় যে, আশুরার সিয়াম মুহার্‌রাম মাসের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়, তবে ৯, ১০ তারিখে রাখা উত্তম।

আশুরার সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

وَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السُّنَّةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ.

আশুরার সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র নিকটে আশা রাখি যে, এটা বিগত এক বছরের পাপ মার্জনা করে দেবেন (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৪৬)।

আইয়ামে বীয (প্রত্যেক চাঁদে তিন দিন সিয়াম রাখা) ঃ প্রত্যেক চাঁদে (মাসে) তিন দিন সিয়াম রাখা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিয়মিত আমল। তিন দিন সিয়াম পালন করলে পুরো মাস সিয়াম রাখার সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهٖ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ اَيَّامٍ.

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম রাখে তা এমন যেন সারা বছর সিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তার কিতাবে নাযিল করেন যে কেউ একটি ভালো কাজ করে তার প্রতিদান হলো এর দশগুণ (সূরাহ্ আনআম ৬/১৬০)। সুতরাং একদিন দশদিন সমপরিমাণ (তিরমিযী হাঃ ৭৬২, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৭০৮, সনদ সহীহ্)।

চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে এই সিয়াম রাখা সুন্নাত যেমন হাদীসে এসেছে —

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, হে আবূ যার তুমি যখন মাসে তিন দিন সওম পালন করতে চাও, তাহলে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে করবে (হাসান সহীহ্ তিরমিযী হাঃ ৭৬১, নাসাঈ হাঃ ২৪২৪, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ হাঃ ২১২৮, ইরওয়া ৯৪৭)।

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখা ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখার ইসলামে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَ اَنَا صَائِمٌ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দার) আমল পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আমার আমল পেশ করার সময় আমি সওম অবস্থায় থাকি (সহীহ্ লিগায়রিহী ঃ তিরমিযী হাঃ ৭৪৭, ইরওয়া ৯৬৯)।

যে দিনে সিয়াম রাখা নিষেধ ঃ

(ক) সওমে বিসাল ঃ ইফতার ও সাহারী ছাড়া দিনের

পর দিন সিয়াম পালন করা। হাদীসে এসেছে —

اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ.

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিরতিহীন সওম (সওমে বিসাল) পালন করতে নিষেধ করেছেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৬৫)।

শনিবার সিয়াম রাখা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ اُخْتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ اِلَّا فِيْهَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু বসুর (রহঃ) হতে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত — রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের উপর ফরযকৃত সওম ছাড়া তোমরা শনিবারে আর অন্য কোনো সওম পালন করোনা। আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া তোমাদের যদি কেউ আর কিছু না পায় (সেদিনের আহারের জন্য) তবে সে যেন তাই চিবিয়ে নেয় (সওম ভাঙার জন্য) (সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৭২৬, তিরমিযী হাঃ ৭৪৪)।

শুক্রবার সিয়াম রাখা ঃ হাদীসে এসেছে —

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِىْ غَدًا ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ فَاَفْطِرِىْ وَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَاَمَرَهَا فَاَفْطَرَتْ.

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জুমুআর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি (জুয়াইরিয়াহ্) সওম পালন রত অবস্থায় ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গতকাল সিয়াম পালন করেছিলে? তিনি বলেন, না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি কি আগামীকাল সওম পালনের ইচ্ছা রাখো? তিনি বলেন, না। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তাহলে সওম ভেঙে ফেলো। হাম্মাদ ইবনু জাদ স্বীয় সূত্রে জুয়াইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে আদেশ দেন এবং তিনি সওম ভেঙে ফেলেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৮৬)।

সারা বছর সিয়াম রাখা ঃ সারা বছর সিয়াম পালন করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর সারা বছর সিয়াম পালন করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর সিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর চেয়ে উত্তম সিয়াম আর নেই (নাসাঈ হাঃ ২৩৭৩)।

দুই ঈদের দিন সিয়াম রাখা ঃ এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে—

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ النَّحْرِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৯১, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৮২৭)।

আইয়ামে তাশরীকের সিয়াম ঃ আরবী যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয় (অর্থাৎ কুরবানীর পরের তিন দিনকে)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ.

নুবাইশাতুল হুযালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন আইয়ামে তাশরীক হল খাওয়া, পানাহার ও আল্লাহ্‌র যিকরের

পরবর্তী অংশ ৩৩ পাতায়

৮ম পর্ব

أحكام الأذان والأقامة
আযান ও ইক্বামাতের বিধান

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(৫৯) যদি উপরোক্ত দলীলগুলিকে উক্ত আযানের উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তথাপি উত্তম হবে কেবল একটি আযান দেওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, এটিই হ'ল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (সূরাহ্ নিসা ৪/৫৯)

আর এই নীতিই ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন —

وَ إِنِّىْ لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ أَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَدًا وَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

যদি আমি খলীফা নিয়োগ না করি, তবে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত হবে, কারণ তিনি খলীফা নিয়োগ করেননি। আর যদি নিয়োগ করি, তবে আবূ বাকরের সুন্নাত হবে, কারণ আবূ বাকর নিয়োগ করেছিলেন।.... শেষে তিনি রসূলের সুন্নাতকে প্রাধান্য দিয়ে খলীফা নিয়োগ করেননি (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩৪০০) এবং আস্থাভাজন তাবেয়ী মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন —

شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِىٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

আমি উসমান এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সাথে হাজ্জে উপস্থিত ছিলাম। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাজ্জে তামাত্তু করতে এবং হাজ্জ ও উমরার তালবিয়াহ্ থেকে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখলাম তিনি হাজ্জ ও উমরার একসাথে তালবিয়াহ্ বলছেন এবং তিনি বললেন, আমি কোনো একজনের কথাতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত ছাড়বো না (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৫৬৩)। অনুরূপ এক শামী ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রশ্ন করল হাজ্জে তামাত্তু করা যাবে? তিনি বললেন, করা যাবে। সে বলল, আপনার আব্বা নিষেধ করেছেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন —

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِىْ نَهَى عَنْهَا وَ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، أَمْ أَمْرَ أَبِىْ نَتَّبِعُ ؟ أَمْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

আচ্ছা বল, আমার আব্বা যদি তা থেকে নিষেধ করেন আর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) করেছেন তবে আমার আব্বার অনুসরণ করবো না রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর? সে ব্যক্তি বলল, বরং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) করেছেন (জামেউত তিরমিযী হাঃ ৮২৪ সূত্র সহীহ্)।

(৬০) প্রথম মতটি সঠিক না হওয়ার কারণ সমূহ ঃ (ক) উক্ত মতের স্বপক্ষে পেশকৃত দলীলগুলির কোন একটিও মত পেশকারীদের দাবী পূরণে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তাঁরা যে উদ্দেশ্যে মত পেশ করেছেন দলীলগুলি সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে অক্ষম। যা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

(খ) আমরা এর পূর্বে জেনেছি ঠিক কী কারণে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আযান বৃদ্ধি করেছিলেন। কোথাও যদি উপরোক্ত কারণগুলি না পাওয়া যায়, তবে সেখানে অকারণে মাসজিদে দুটি আযান দিয়ে প্রথম আযানকে উসমানী আযান বলে দাবী করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা উলামাগণের অনুমোদিত একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল —

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوْدًا وَ عَدَمًا

শারয়ী বিধান, তার কারণের বিদ্যমান হওয়া ও না হওয়ার সাথে আবর্তিত হয় (দেখুন উসূলুল ফিকহের গ্রন্থ সমূহ)। এর ব্যাখ্যায় আল্লামাহ্ আব্দুর রহমান আস্ সাদী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন—

فالعلل التامة التى يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، و متى فقدت لم يثبت الحكم.

শারয়ী বিধান প্রণেতা, যে পূর্ণাঙ্গ কারণ সমূহের উপর শরীয়তের বিধানসমূহ সাজিয়েছেন, যখন সে কারণগুলি প্রাপ্ত হবে তখন বিধানও পাওয়া যাবে; আর যখন সেগুলি অনুপস্থিত হবে বিধানও প্রমাণিত হবে না (রিসালাতুন লাতীফাতুন জামিয়াতুন ফী উসূলিল ফিক্বহিল মুহিম্মাতি ১/১০৫)। অর্থাৎ যখন বিধান প্রণেতা কোনো বিধানকে কোনো কারণের সাথে সম্পৃক্ত বা শর্তযুক্ত করে দেন, সে কারণ শেষ হয়ে গেলে সে বিধানও শেষ হয়ে যাবে। যেমন মদে নেশা থাকার কারণে তা হারাম। যদি মদের নেশা শেষ হয়ে যায় তবে তা সিরকা (এক প্রকার অল্প স্বাদ পানীয়) তে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং তা আর হারাম হবে না (ই'লামুল মুওয়াক্বিয়ীন আন্ রব্বিল আল্ লামীন লি ইবনিল ক্বায়্যেম আল জাউযিয়াহ ৪/৯০)।

(৬১) কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে কারণে বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফে রামল করার (প্রথম তিন দফায় দ্রুত চলার) আদেশ দিয়েছিলেন এখন তো আর সে কারণ বিদ্যমান নেই, তার মানে কি এখন আর রামল করা যাবে না? যদি করা যাবে না তো এক আযানের মত পোষণকারীগণ রাম্‌লকে নাজায়েযের ফাতাওয়া কেন দিচ্ছেন না আর যদি জায়েয তবে জায়েযের দলীল পেশ করুন।

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রামল এর আদেশ দিয়েছিলেন উমরাহ্ ক্বাযার সময়। আবার হাজ্জাতুল অদায় রামল করে তিনি এটাকে চিরদিনের জন্য সুন্নাত করে দিয়েছেন। (ক) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন —

رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّتِهِ، وَفِى عُمَرِهِ كُلِّهَا وَ أَبُوْ بَكْرٍ، وَ عُمَرُ، وَ عُثْمَانُ وَ الْخُلَفَاءُ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের হজ্জে, প্রত্যেক উমরায় এবং আবূ বাকর, উমার, উসমান ও অন্যান্য খুলাফাগণ রামল করেছেন (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৯৭২, মুসনাদ আবী ইয়ালা হাঃ ২৪৯২, সূত্র সহীহ্। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং শুয়াইব আরনাউত এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)।

(খ) নাফে' (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন —

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرْمُلُ الثَّلَاثَ ، وَ يَمْشِىْ الْأَرْبَعَ ، وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ، ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার যখন হজ্জ ও উমরার জন্য আসতেন তিনি নিজের তাওয়াফে তিনবার রামল করতেন এবং চারবার আস্তে চলতেন আর বলতেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এমনটা করতেন (সুনানু নাসায়ী হাঃ ২৯৪৩, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৪৬১৮ সূত্র সহীহ্। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, শুয়াইব আরনাউত এবং হাফিয যুবাইর আলী যাঈ তার সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)।

(৬২) উক্ত আযান সম্পর্কে কিছু বিশ্ববরণ্যে মুহাক্কিক উলামাগণের বক্তব্য ঃ (ক) ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন—

وَأحب أَن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الامام المسجد و يجلس على موضعه الذى يخطب

عليه ... فاذا فعل أخذ المؤذن فى الأذان، فاذا فرغ قام فخطب، لا يزيد عليه.

আর আমার নিকট পছন্দনীয় হল জুমুআর দিন যখন ইমাম বের হয়ে (তাঁর বক্তব্য দেওয়ার জায়গায়) মিম্বারে বসে পড়বেন, ... মুয়ায্যিন আযান আরম্ভ করবে, আযান শেষে খাতীব দাঁড় হয়ে খুৎবা শুরু করবেন। এর বেশি কিছু হবে না (আল্ উম লিশ্ শাফিয়ী ১/২২৪)।

(খ) হানাফী আলেম আহমাদ আল্ জাস্ সাস্ (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী) লিখেছেন —

وَ اَمَّا اَصْحَابُنَا فَاِنَّهُمْ اِنَّمَا ذَكَرُوْا اَذَانًا وَ اَحِدًا اِذَا قَعَدَ الاِمَامُ على المنبر، فاذا نزل اقام على ما كان فى عمر رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ أَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ ؓ.

আমাদের মাযহাবের উলামাগণ, ইমামের মিম্বারে বসার পর এক আযানই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম খুৎবা থেকে নামলে ইকামাত দিবে যেমনটা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং আবূ বাকর, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র যুগে ছিল (আরকামুল কুরআন ৫/৩৩৬)।

(গ) আবুল হাসান মাওয়ারদী (মৃত্যু ৪৫০ হিজরী) বলেন—

فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَمُحْدَثٌ ، فَعَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لِيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِحُضُوْرِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْمَدِيْنَةِ وَ كَثْرَةِ أَهْلِهَا.

জুমুআর প্রথম আযান শরীয়তে নব আবিষ্কার। যখন মদীনার শহর ব্যাপকতা লাভ করল এবং মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটা বৃদ্ধি করেছিলেন যাতে করে মানুষ খুৎবায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে (তাফসীরুল মাওয়াদী ৬/৯)।

(ঘ) আল্লামাহ্ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন —

وَحَرَصُوْا على ابْقَاءِ الْأَذَانِ قَبْلَ خُرُوْجِ الامام، وقد زالت الحاجة اليه، لأنَّ المدينةَ لم يَكُنْ بها الا المسجد النبوى، وَ كَانَ النَّاسُ كُلهُم يَجمَعُوْنَ فِيْهِ، وَ كَثُرُوا عَنْ أَنْ يَسمعُوا الأذان عندَ بَابِ المَسْجِد، فزاد عثمانُ الاذان الاول، ليعلم مَنْ بالسوق وَ مَنْ حَوْلَه حُضُوْرَ الصَّلاَةِ اَمَّا الان وَقد كثرت المساجد، و بنيت فيها المنارات، وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة، فانا نرى أن يكتفى بهذا الاذان، و ان يكون عِنْدَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ اتباعًا للسنةِ ، او يؤمَرُ المؤذنون عندَ خُرُوْجِ الامام أن يوذنوا على أبواب المساجد.

খুৎবার জন্য ইমামের বের হওয়ার পূর্বের আযানকে লোকেরা আঁকড়ে ধরে আছে। অথচ এখন তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তখন মাসজিদে নববী ছাড়া মদীনায় আর কোনো জামে মাসজিদ ছিল না। ফলে মদীনার সমস্ত মানুষ জুমুআর স্বলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাসজিদে নববীতেই সমবেত হতেন। কিন্তু লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে, তাঁরা আর দরজার আযান শুনতে পেতেন না। সুতরাং উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম আযান বৃদ্ধি করলেন। যাতে বাজার এবং তার কাছাকাছি অবস্থানকারী লোকজন স্বলাতে জুমুআর উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কিন্তু এখন প্রত্যেক এলাকায় মাসজিদের সংখ্যা বেড়েছে, তাতে মিনার বানানো হয়েছে (তাতে মাইক রাখা হয়েছে) এবং জুমুআর স্বলাতের সুন্নাতী আযানের সময় সম্পর্কে এখন মানুষ খুব সচেতন। সুতরাং আমি মনে করি এই আযানকেই যথেষ্ট মনে করা দরকার। যা সুন্নাতের অনুসরণে ইমামের বের হওয়ার সময় দেওয়া হবে। অথবা মুয়ায্যিনদেরকে নির্দেশ দিতে হবে যেন ইমাম বের হওয়ার সময় মাসজিদের দরজায় দেওয়া হয় (জামেউত তিরমিযীর টীকা ২/৩৯৩)।

(ঙ) ভারতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামাহ্ ওবাউদুল্লাহ্ মুবারাকপুরী (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন —

اذا وَ قعت اليَوْمَ الحَاجَة الى النداءِ العُثْمَانِى فِى بَلَدٍ كَمَا وَقعت بالمَدِينَةَ فى عهد عُثْمَانَ رضى الله عنه فلا بأسَ بِأَنْ يؤذن على مَوضِعٍ مُرتفعٍ كالمنار أو سَطحِ البيتِ خارج المَسجدِ قبلَ خُروجِ الامامِ كمَا كانَ فى زَمَنِ عُثمانَ رَضِىَ الله عنه وَ أَمَا بغَيْرِ الْحَاجَةِ وَ عِنْدَ عَدمِ الضرُورَةِ فالاكتفاءُ بالاذانِ عند خُروجِ الامَامِ هُو المُتَعَيَّنُ عِنْدِى.

যদি আজ কোনো এলাকায় উসমানী আযানের প্রয়োজন হয়, যেমন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সময় মদীনায় প্রয়োজন হয়েছিল তবে মাসজিদের বাইরে কোনো উঁচু স্থানে যেমন মিনার কিংবা বাড়ির ছাদ ইত্যাদিতে ইমাম খুৎবার জন্য বের হওয়ার পূর্বেই আযান দেওয়ায় কোনো দোষ নেই। যেমন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দিয়েছিলেন। আর যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে, তবে শুধু খুৎবার আযানই যথেষ্ট। আর এটাই আমার নিকট নির্ধারিত (মিরআতুল মাতাতীহ্ ৪/৪৯২-৪৯৩)।

(চ) মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন —

متى يشرع الأذان العثمانى ؟ : فاذن انما يكون الاقتداء به رضى الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذى من اجله زاد عثمان الأذان الأول ... و هذا السبب لا يكاد يتحقق فى عصرنا هذا الا نادرا.

কখন উসমানী আযান শরীয়ত সম্মত হবে? অতঃপর বলেন, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কারণে মদীনায় প্রথম আযান বৃদ্ধি করেছিলেন যখন সে কারণ প্রমাণিত হবে, তখন নিশ্চয় তাঁর অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের এ যুগে সেকারণ সাব্যস্ত না হওয়ার মধ্যেই (আল্ আজ্বিবাতুন নাফিয়াহ্ ১/২০)।

(৬৩) মক্কায় হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ দ্বারা চালুকৃত আযানকে উলামাগণ বাতিল ও বিদ্আত বলেছেন। কারণ উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে সব কারণকে সামনে রেখে প্রথম আযান চালু করেছিলেন সে কারণগুলির একটিও সেখানে বিদ্যমান ছিল না। দ্বিতীয়তঃ হাজ্জাজের আযান হত মাসজিদে।

(ক) বিশ্বাসযোগ্য তাবেয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ্ (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন —

اِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهٖ حِيْنَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ فَلَا يَسْتَوِىْ الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ ذٰلِكَ، وَ ذٰلِكَ حِيْنَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُؤَذَّنُ الْأَوَّلُ ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ بِهِ الْآنَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ وَ جُلُوْسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ.

সাহাবাগণের যুগে জুমুআর একটাই আযান হত অতঃপর ইক্বামাত। সে আযানটি দেওয়া হত ইমামের মিম্বারে বসার সাথে সাথে। মুয়ায্যিনের আযান শেষ হলেই ইমাম দাঁড়িয়ে খুৎবা আরম্ভ করতেন আর তখনই বেচাকেনা হারাম হয়ে যেত আর এটাই হত প্রথম আযান। কিন্তু এখন যে আযানটি ইমামের মিম্বারে বসার পূর্বে দেওয়া হয় সেটি বাতিল। এ বিদআত সর্বপ্রথম মক্কায় চালু করেছে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ (মুসান্নাফ আব্দির রাযযাক হাঃ ৫৩৩৯ সূত্র সহীহ)।

(খ) আমর ইবনু দীনার (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন —

أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ : وَ أَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ.

জুমুআর দিনে প্রথম আযান বৃদ্ধি করেছেন সর্বপ্রথম উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন বাড়ালেন। আযান দেওয়া হত যাওরায়। আর আমাদের শহর

(মক্কায়) প্রথম বৃদ্ধি করেছে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ (মুস্বান্নাফ আব্দির রাযযাক্ব হাঃ ৫৩৪১ সূত্র সহীহ)।

(৬৪) একটি প্রশ্ন ঃ উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম আযান যাওরা নামক বাজারে দেওয়া করিয়েছিলেন, কারণ তখন মাইক ছিল না। কিন্তু এখন প্রত্যেক মাসজিদে মাইক রয়েছে। সুতরাং উক্ত আযান প্রয়োজনের জায়গায় না দিয়ে মাসজিদে দিলে তা ওখানকার মানুষ সে আযান শুনতে পাবে। এখন আর ওখানে আযান দেওয়ার কী দরকার এবং মাসজিদে দিলেই বা কী ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ (ক) যেমন, প্রত্যেক মাসজিদে মাইক থাকার কারণে, উক্ত আযান মাসজিদে দিলেই বাইরের লোকেরা শুনতে পাবে বাইরে আর আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঠিন তেমনি উসমানী আযান না দিয়ে সুন্নাতী আযান দিলেই তা সবাই শুনতে পাবে আর উসমানী আযানের প্রয়োজন নেই। (খ) সে আযান মাসজিদে দিলে এটাই ক্ষতি হবে যে সেটা সুন্নাতে উসমানী না হয়ে বিদআতে হিশামী হবে।

সম্মানিত পাঠক! (ক) আশা করি উপরোক্ত আলোচনা থেকে খুব ভালোভাবেই বুঝেছেন যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র যুগে কিছু সমস্যা দেখা দিলে তিনি সেই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এলাকায়ী প্রয়োজন ভেবে খুৎবার আযানের পূর্বে, মাসজিদের বাইরে যাওরা নামক বাজারে একটি ছাদের উপর একটি আযান চালু করেন। কিন্তু এখন পাড়ায় পাড়ায় মাসজিদ হয়েছে, মাসজিদে মাসজিদে মাইক হয়েছে, হাতে হাতে ঘড়ি হয়েছে, মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। সুতরাং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগে একটা আযানই ছিল। তাঁদের অনুসরণে আমাদেরকেও এখন এক আযানেই ক্ষান্ত হতে হবে। (খ) এ আযান তিনি মাসজিদে নববী ছাড়া ইসলামী বিশ্বের কোনো মাসজিদে চালু করার নির্দেশ দেননি। অথচ সে সময় বহু জামে মাসজিদ ছিল। কারণ সে সব জায়গায় উক্ত সমস্যাগুলি বিদ্যমান ছিল না।

(৬৫) জুমুআর আযানের স্থান ঃ এ বিষয়ে উলামাগণের দুটি প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে। **(ক) জুমুআর আযান দিতে হবে খতীবের সামনাসামনি মিম্বারের কাছাকাছি স্থানে।** সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

كَانَ النِّدَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ أَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এদের যুগে জুমুআর আযান দেওয়া হত মিম্বারের নিকট .... (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্ তাবারানী হাঃ ৬৬৪৬, সুলাইমান আত্ তাইমী মুদাল্লিস রাবী এবং তিনি আন' শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন এর সূত্র যঈফ। কিন্তু হাফেয যুবাইর আলী যাঈ এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ দাউদ হাঃ ১০৮৮ এর টীকা। ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১১৩৫ এর টীকা)।

كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَ أَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ.

(খ) মাসজিদের দরজায় ঃ সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত হয়েছে— তিনি বলেন —

জুমুআর দিন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এদের সামনে জুমুআর আযান দেওয়া হত মাসজিদের দরজায় (আবূ দাউদ হাঃ ১০৮৮, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস এবং তিনি হাদীস আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন ফলে এর সূত্র যঈফ)। এ মর্মে আল্লামাহ্ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন —

فظن العوام، بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن فى مواجهة الخطيب، على كرسى أو غيره ، وصار هذا الأذان تقليدًا صرفًا، لا فائدة له فى دعوة الناس الى الصلاة و اعلامهم حضورها ...

উক্ত হাদীস থেকে সাধারণ লোকেরা বরং অধিকাংশ উলামা ভেবেছেন জুমুআর আযান হবে খতীবের সামনাসামনি। কাজেই মুয়ায্যিনের স্থান করেছেন খতীবের সামনাসামনি কেদারা ইত্যাদির উপর। আর এটা প্রথাগত কালচক্রে পরিণত হয়েছে। এতে মানুষকে স্বলাতের জন্য আহ্বান করার এবং তাদের স্বলাতের উপস্থিতি

সম্পর্কে অবহিত করার কোনো লাভ হয় না (জামেউত তিরমিযী ২/৩৯৩)।

আল্লামা ওবাইদুল্লাহ্ মুবারাকপুরী লিখেছেন —

و أما كون هذا الأذان أمام الخطيب مواجهة قريبًا من المنبر فليس فى شيء من السنة، فان السنة ان يؤذن عند باب المسجد ليحصل فأئدة الأذان لا داخل المسجد عند المنبر، و الله تعالى أعلم.

আর এ আযান খতীবের সামনে মিম্বারের নিকটে দেওয়া সম্পর্কে সুন্নাত সম্মত নয়। বরং সুন্নাত হল, মাসজিদের দরজায় আযান দেওয়া যাতে আযানের লাভ হাসেল করা যায়। মাসজিদের ভিতর মিম্বারের নিকটে নয় (মিরয়াতুল মাফাতীহ্ ৪/৪৯২)। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

সচেতন পাঠক! সূত্রের দিক দিয়ে উভয় হাদীসই যঈফ। কিন্তু আযানের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে দ্বিতীয় মতই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তাই উলামাগণ দ্বিতীয় মতকেই প্রধান্য দিয়েছেন।

---

২৭ পাতার পর —

দিন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১১৪১, আবূ দাউদ হাঃ ২৪১১, ইবনে মাজাহ্ ১৭২০)।

নফল সিয়াম ভাঙা ও কাযা ঃ ওযর ছাড়াই নফল সিয়াম ভাঙা যায় এবং পরে তার কাযা আদায় করারও আবশ্যকতা নেই (মিশকাত হাঃ ১৯৭৬)। প্রকাশ থাকে যে, নফল সিয়ামের জন্যও নিয়ত করতে হবে, তবে সাহারী খাওয়ার পূর্বে নফল সিয়ামের জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। নিয়ত মনে সংকল্প করতে হবে মুখে উচ্চারণ করার সহীহ্, যঈফ, জাল কোনও দলীল নেই। মাযহাবী ভাইয়েরা যা মুখে পড়েন তা তাঁদের নিজস্ব বানাওয়াট মাত্র। তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে দুআ করি, আল্লাহ্ যেন সকল মুমিন ব্যক্তিকে নফল সিয়াম রাখার তাওফীক দান করেন — আমীন।

৭ম পর্ব

সত্য গ্রহণে বাধা

মোঃ মহররাম আলী

৮ নং অসিলা ঃ

يَـاَيُّهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوا اتَّـقُـوا اللّٰـهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْـهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর যাতে তোমরা সফল হও (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৩৫)।

আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। الوسيلة শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। পূর্ববতী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান, সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وسيله শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহ) বলেন, ইবনু জারীর আতা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন — تقربو اليه بطاعته و العمل بما يرضيه

অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে (ইবনে কাসীর)। অতএব আয়াতের সার ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অন্বেষণ করা।

সুধী পাঠক! এক শ্রেণির মানুষ وسيله অসীলা বুঝতে গিয়ে পীর ধরাকে নিজেদের জন্য ফরয করেছে। যার ফলে বহু মানুষ আজ সত্য থেকে দূরে আছে অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করতে পারছে না। বাতিল পন্থীদের অত্র আয়াত দলীল হিসাবে প্রমাণ করতে চায়। আমরা তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরব ইন্শা-আল্লাহ্।

সুধি পাঠক! যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন আমি, আপনি এমনকী কোন পীরও ছিল না। তখন উপস্থিত ছিলেন আমার ও আপনার প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁরা কী বুঝেছেন وسيله অসীলা শব্দ দ্বারা তা আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করব

ইনশাআল্লাহ্। কুরআনে আরো একটি আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্কে ডাকে এবং তাদের রবের নিকট অসীলা অন্বেষণ করে তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী? এবং তারা তাঁর রহমত কামনা করে ও তাঁর আযাবের ভয় করে, নিশ্চয় তোমার রবের আযাব বড়ই ভীতিকর (সূরাহ্ বানী ইরসাঈল ১৭/৫৭)।

আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন এখানে 'অসীলা' অর্থ হল القربة তথা নৈকট্য। এমনটাই বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, আবী ওয়াইল এবং হাসান বাসরী থেকে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু কাসীর, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ সহ অনেকে এ মত প্রকাশ করেছেন। ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনা এসেছে, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হও এবং এমন আমল কর যার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়। এ মত বর্ণনার পরে আল্লামা ইবনু কাসীর বলেছেন, 'অসীলা' এর এ তাফসীরে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। আর 'অসীলা' হচ্ছে সেই বিষয় যার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় (তাফসীর ইবনু কাসীর)।

'অসীলা' মূলত দুই প্রকার — (ক) وسيلةٌ كونيةٌ জাগতিক অসীলা (খ) وسيلةٌ شرعيةٌ শারঈ অসীলা।

প্রথমে আমরা দেখবো وسيلةٌ كونيةٌ বা জাগতিক অসীলা কী? পৃথিবীতে যা স্বাভাবিক বা সৃষ্টি জগতে ঐসব মাধ্যম যার দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, কোন প্রকার কমবেশি ছাড়াই মুমিন কাফির সকলকেই যা প্রদান করা হয়েছে। যেমন পানি— যার মাধ্যমে পিপাসা নিবারণ হয়। খাদ্য— যার মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ হয়। পোশাক — যার মাধ্যমে গরম থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কোন গাড়ি — যার মাধ্যমে একস্থান থেকে সফর করে অন্যস্থানে যাওয়া যায়। এগুলি হল জাগতিক 'অসীলা' বা মাধ্যম। যা আমাদের দুনিয়াবী কাজকর্মের এক একটি মাধ্যম বা 'অসীলা'।

(খ) وسيلةٌ شرعيةٌ বা শারঈ অসীলা ঃ— প্রত্যেক ঐসব মাধ্যম যার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। ইসলামী শরয়ী পন্ধতি অনুযায়ী যা মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এবং রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন। যারা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে ও জান্নাত লাভ করতে চায় তাদের এই আদেশ মান্য করতে হবে। যেমন কেউ যদি ভালভাবে জেনে বুঝে ইখলাসের সাথে কালিমাহ্ শাহাদাত উচ্চারণ করে এর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে মুক্তি লাভ হয়, অশ্লীল বা মন্দ পাপের কাজ করার পরে যদি নেকির বা পুণ্যের কাজ করলে এর মাধ্যমে পূর্বের পাপ মোচন হয়। আযানের পর নির্ধারিত দুআ পড়লে এর মাধ্যমে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শাফায়াত লাভ করা যায়। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا على فانه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لى الوسيلةَ فانها منزلة فى الجنه لا تنبغى الا لعبدٍ من عباد الله وارجو ان اكون انا هو، فمن سَأَلَ لى الوسيلة حلت له الشفاعة.

অর্থ ঃ যখন তোমরা আযান মুয়ায্যিনকে দিতে শুনবে তখন মুয়ায্যিন যা বলবে তোমরাও তা বলো অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে দশটি রহমত দান করবেন অতঃপর তোমরা আমার জন্য 'অসীলা' চাও কেননা তা হচ্ছে এমন এক মর্যাদাকর স্থান যা আল্লাহ্র এক বান্দা পাবেন আর আমি আশা করি আমিই সে ব্যক্তি। আর যে আমার জন্য 'অসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে (মুসলিম ৭৩৫ নং)।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

من سره ان يبسط عليه رزقه او ينسَأ فى اثرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রশস্ততা কিংবা দীর্ঘায়ু

পছন্দ করে, সে যেন তার আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে (মুসলিম ৬৪১৭)।

এখানে 'অসীলা' বা মাধ্যম আত্মীয়তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

সুধী পাঠক! কিছু মানুষ 'অসীলা' বা মাধ্যম বুঝতে না পেরে ওলী-আওলিয়া এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরের পার্শ্বে গিয়ে কবরবাসীর 'অসীলা' (মাধ্যমে) সাহায্য চায়। যাতে করে কবরবাসীরা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ পূর্ণ করতে পারে না। এই বিশ্বাস তাকে সত্য গ্রহণ করতে দেয়। যার ফলে সত্য কি অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। এই জন্য পীর, দরবেশ, ওলী-আওলিয়া এবং বড় নেতাদের নিকট ছুটে যায় মাধ্যম অর্থাৎ অসীলা গ্রহণ করার জন্য যা শিরকের আওতায় পড়ে।

বৈধ তথা শরীয়ত সম্মত অসীলা (মাধ্যম) বুঝার একমাত্র পদ্ধতি হলো কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অধ্যয়ন করা, সেদিকে নজর ফিরানো, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে যেটাকে বৈধ বলা হয়েছে সেটিই বৈধ। পক্ষান্তরে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে যাকে অবৈধ বলা হয়েছে তাই অবৈধ। অপরদিকে জাগতিক বিশুদ্ধ 'অসীলা' চেনার সঠিক পদ্ধতি হলো নিরাপদ দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা। উল্লেখ্য যে, জাগতিক 'অসীলা' ব্যবহারের দুটি শর্ত রয়েছে — (১) অসীলাটি শরীয়ত কর্তৃক বৈধ ঘোষিত হওয়া। (২) বাস্তব অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় অসীলার ক্ষেত্রে মানুষের ধারণা হল যে, কোন উপায়ে একটু উপকার পেলেই হয়, তা বৈধ কি অবৈধ সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকগুলোকে শয়তান বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং এ সমস্ত বাতিল আক্বীদার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। এ বিষয়ে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যম। যেমন জ্যোতিষী, গনক, তারকাবিদ, যাদুকর এবং ভেলকিবাজদের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করে অদৃশ্যের জ্ঞান জানতে চায়। এ মর্মে এ সমস্ত যাদুকর-গনকের কিছু কথা মাঝে মাঝে সত্য হয়ে থাকে। তার একটি সত্যের সাথে নিরানব্বইটি মিথ্যা সংমিশ্রণ করে জনসম্মুখে তাদের বাতিল আক্বীদাহ্ প্রচারে বিভিন্ন প্রয়াস চালায়। তার ফলে সাধারণ জনগণ তাদের এ ধরণের ভেলকিবাজীর গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে ঈমান হারায়। সুধী পাঠক! আপনার আমার উচিত যে, শুধু উপকার পেলেই তা গ্রহণ না করে শরীয়তের বৈধতা আছে কি না তা যাচাই করা। তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন

يَسْـئَلُوْنَكَ عَـنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

অর্থঃ তারা আপনাকে মদ, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলেদিন, এ দুটিতে রয়েছে মারাত্মক পাপ এবং মানুষের জন্য নানাবিধ উপকার। তবে তার উপকারের তুলনায় পাপ বেশি (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২১৯)।

প্রিয় পাঠক! কিছু উপকার আছে বলেই শরীয়তের কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হওয়া বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ্ অত্র আয়াতে মদ খাওয়ার কিছু উপকারিতার কথাও বলেছেন। এ মানসিকতা পরিত্যাগ করতে না পারলে আমরা সত্য গ্রহণ করতে পারব না। আর সত্য না গ্রহণ করে বহু মানুষ পীর, অলি-আওলিয়াগণের নিকটে যাই শুধুমাত্র অসীলা গ্রহণ করতে। এদের বিশ্বাস তাদের যে কোনো ভাল কাজ আমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে পৌঁছিয়ে দেবার (মাধ্যম) অসীলা পীর, অলি-আওলিয়া, যা মূলতঃ মক্কার কাফের-মুশরিকদের কর্ম তারা মূর্তিপূজা করত আর বলত—

مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

আমরা তো এদের ইবাদাত এ জন্য করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দেবে (সূরাহ যুমার ৩৯/৩)।

সুধী পাঠক! তবে সাধারণতঃ এ সকল পীর-পূজারী নামে মুসলিম আর মূর্তিপূজারী মুশরিকদের পার্থক্য কী? একটু চিন্তা করুন? এর জন্যই নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত মুশরিকরা এই অজুহাত দেখিয়ে মূর্তিপূজা করছে। সত্য গ্রহণ করছে না। আর যারা পীর মুরীদের সঙ্গে যুক্ত আছে তারাও একই অজুহাত দিয়ে সত্য গ্রহণ করতে পারছে না।

আসুন পরিশেষে আমরা বৈধ অসীলাগুলি বুঝার চেষ্টা করি। বৈধ অসীলা তিন প্রকার — যথাক্রমে আমরা এগুলি নিয়ে আলোচনা করবো ইন্শা-আল্লাহ্।

(১) বৈধ অসীলা ঃ আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম অথবা মহৎ গুণাবলীর মাধ্যম গ্রহণ করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় (মাধ্যমে) তোমরা তাঁর নিকট আবেদন কর (সূরা আ'রাফ ৭/১৮০)।

হাদীসে এসেছে —

اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق الحينى ما علمت الحياة خير الى و توفنى اذا علمت الوفاة خير الى.

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানের অসীলার (মাধ্যমে) তোমার নিকট এ দুআ করছি যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা কল্যাণ মনে করবে ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো আর যদি আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয় তাহলে মৃত্যু দান কর (নাসাঈ ১৩০৫)।

اللهم انى اسألك يا الله الاحد الصمد الذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد ان تغفلى ذنوبى انك انت الغفور الرحيم.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌, হে একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তার সমকক্ষও কেউ নেই, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান (আবূ দাউদ ৯৮৫)। সুধী পাঠক ! এটাই অসীলা।

(২) বৈধ অসীলা ঃ দু-আকারী নিজের সৎ আমলের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করে দুআ করবে —

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ ঃ মুমিন তো তারাই, যারা বলে হে আমাদের রব ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন (সূরাহ্‌ আলে ইমরাণ ৩/১৬)।

আরো একটি আয়াত —

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষী প্রদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন (সূরাহ্‌ আলে ইমরাণ ৩/৫৩)। প্রিয় পাঠক ! এটাই অসীলা।

(৩) বৈধ অসীলা সৎ ব্যক্তির দুআর মাধ্যমে অসীলা করা ঃ উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহ্‌ আনহু) এর অসীলা (মাধ্যম) দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্‌ ! (আগে) আমরা আমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অসীলা দিয়ে দুআ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর চাচার অসীলা দিয়ে দুআ করছি। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দুআর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো (বুখারী ১০১০)। অসীলা জীবিত ব্যক্তির হবে মৃত কোনো ব্যক্তির নামে হবে না। অত্র হাদীসে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, মৃত কোনো অলি-আওলিয়া কিংবা কোনো পীরের নামে অসীলা হবে না। বর্তমান বিশ্বে কিছু সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে অধিকাংশ মানুষ অসীলার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা হতে বহু দূরে আছে। যার ফলে সত্য গ্রহণ করতে পারে না বরং শিরকের মত কর্মে তারা লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে সত্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে অসীলার সঠিক ব্যাখ্যা জানার ও বুঝার তাওফীক দিন এবং সত্য গ্রহণ করার সুমতি দিন — আমীন।

---

২০ পাতার পর —

বছর সময় লাগে। তারপর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইনতেকাল করেন। কিন্তু তাঁর আচরিত দ্বীন (ইসলাম) আমাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এই দ্বীনে এমন কোনো কল্যাণকর বিষয় পরিত্যাগ করা হয়নি, যার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়ে যাননি যা তাঁর উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। আর এমন কোনো অপকর্ম পাপ কাজ বা অকল্যাণকর বিষয় নেই যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করে যাননি।

শেষ পর্ব

আসল আহ্লুস সুন্নাহ্ কে?

মূল ঃ ফাযীলাতুশ্ শায়খ হাফিয আব্দুল্লাহ্, ভাগলপুর
অনুবাদক ঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

মুহাম্মাদ ঃ অবশ্যই না। কেননা তাদের ভালোবাসা সঠিক নয়। আর ওই ভালোবাসায় উপকার হয় যেটা উভয় পক্ষ থেকে হয়। ঈসা (আঃ) কখনো কোনো এমন ব্যক্তির সাথে ভালোবাসা রাখতেই পারেন না যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আগমনের পর তাঁর অনুসরণ না করে। অনুরূপভাবে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহ্ জিলানী এবং অন্যান্য অলীরাও কখনই ভালোবাসবেন না, যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অনুসরণ করে না বরং শির্ক, বিদ্আত করে এবং নিজেই কারো ইমাম বানিয়ে তাঁর তাকলীদ করে।

মানুষ অজ্ঞাতসারে বুজুর্গদের অনুসরণ করে ও ধোঁকায় পতিত হয়। সুতরাং তারা যা আমল করে সেগুলো ভ্রষ্ট আমল করে যদিও তারা ধারণা করে যে আমরা ভালোই কাজ করেছি (সূরাহ্ কাহ্ফ ১৮/১০৩-১০৪ এর ভাবার্থ)।

বর্তমানে আল্লাহ্ ও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বাদ দিয়ে লোকেরা যারই পূজা বা উপাসনা ও অনুসরণ করে সবই বাতলি ও ধোঁকা। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে জিজ্ঞাসা করবেন —

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ ঃ হে মারয়াম পুত্র ঈসা আপনি কি লোকেদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর?..... (সূরাহ্ মায়িদাহ্ ৫/১১৬)।

উত্তরে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) পুরোপুরি নাকচ করে দেবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেন। তিনি বলবেন, তারা নিজেরাই করত। সুতরাং তাক্বলীদ হল স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। তাক্বলীদ থেকে প্রত্যেককেই বিরত থাকতে হবে।

এখন আপনিই দেখুন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত চান নাকি ইমামের সুন্নাত। যদি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের সঙ্গে সঙ্গ দেয়, তাহলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস আহলুল হাদীসের সঙ্গে মিলিত হল। আর যদি ইমামের সুন্নাত চায় তবে ফিক্বার সাথে মিলে গেল আর ফিক্বহে হানাফী হানাফীদের সঙ্গে মিলে গেল।

হানাফী ঃ সুন্নাত তো রসূলেরই হয়, ইমামের না।

মুহাম্মাদী ঃ যদি ইমামের সুন্নাত না হয়, তবে আপনারা হানাফী হলেন কেন? আচ্ছা হানাফী কাকে বলে?

হানাফী ঃ হানাফী সেই হয় যে ফিক্বহে হানাফীর উপর চলে।

মুহাম্মাদী ঃ ফিক্বহে হানাফী কাকে বলে?

হানাফী ঃ ইমাম আবূ হানীফার মাসলাককে।

মুহাম্মাদী ঃ মাসলাকের অর্থ কী?

হানাফী ঃ মাসলাক ত্বরীক্বা বা পথকে বলে।

মুহাম্মাদী ঃ সুন্নাতকেও তরীক্বা পথ বা পন্থা বলা হয়। যখন আমরা বলি যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত, তখন এর অর্থই হল তাঁর তরীক্বাহ্ বা পথ বা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তিনি এই কাজ করেছেন বা করতে বলেছেন। অর্থাৎ যার পথ, পন্থা বা পদ্ধতির উপর আপনারা চলছেন তাঁরই সুন্নাতের উপর আমল করছেন। আপনি বলুন এটা ঠিক কিনা?

হানাফী ঃ এটা সম্পূর্ণ সঠিক। এটা আমার বোধগম্য হয়েছে।

মুহাম্মাদী ঃ এজন্যই তো আমরা বলি হানাফীরা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর সুন্নাত বা পথ ও পদ্ধতির উপর চলে। আর আসল আহ্লুস সুন্নাহ্ অর্থাৎ আহ্লুল হাদীস রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পথ ও পদ্ধতির উপর চলে।

হানাফী ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর ত্বরীকা পথ পন্থা কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে আলাদা নয়।

মুহাম্মাদী ঃ তরীক্বা ওটাই হোক কিংবা আলাদা হানাফী, হানাফী হয়। সে তো হানাফী পদ্ধতিতে চলে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে। যদি পরিপন্থী হয় তো একটুও ভয় করে না যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতিকূলে হল। যদি অনুকূলে হয় তো সে খুশি হয় না যে আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর আমল করলাম। হানাফীরা যদি স্বলাতের শুরুতে

রাফউল ঈয়াদাইন করে তাও আবার সেটা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত মনে করে না বরং সেটা হানাফী স্বলাত মনে করে। রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ঈয়াদাইন করেনা। কারণ হানাফী স্বলাতে রাফউল ঈয়াদাইন নেই। রাফউল ঈয়াদাইন হানাফী মাযহাবে নেই যদিও তা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত। তারা ঘোড়ার লেজ মারা ও মাছি মারার সঙ্গে সাদৃশ্য দিয়ে থাকে।

হানাফী ঃ আসল কথা হল কোনটা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুকূলে আর কোনটা প্রতিকূলে আমাদের খেয়াল হয় না। আমাদের তো শুধু খেয়াল থাকে যে, আমরা হানাফী, আর আমাদের ফিক্বহের উপর চলতে হবে। যদিও আমাদের সহীহ্ হাদীস দেখানো হয় আমরা সেটার অস্বীকার না করলেও আমল করি না। আমাদের অন্তরে এটাই সন্দেহ উদয় হয় যে হয়তো এই হাদীস সঠিক নয় অথবা এর অর্থ আলাদা কিংবা এই হাদীস রোহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে কিংবা অন্য কিছু। নতুবা আমাদের ইমাম এই হাদীসের উপর আমল করেননি তো আমরা কেন করবো। আমরা তো আমাদের ইমামের মাযহাবের উপর চলবো।

মুহাম্মাদী ঃ এজন্যই তো আমরা বলি যে, হানাফীদের আহলুস্ সুন্নাহ্ দাবী করা ঠিক না। যখন তারা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর চলে না। হানাফীরা যদি ইমামের তাকলীদ বর্জন করে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অনুসরণ করত তবে মুক্তি পেয়ে যেত। কিন্তু তারা পরিত্রাণের কি পরোয়া করবে এই অবস্থায়। আপনি তো আবু হানীফার তাক্বলীদ করেন, যদি মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এরও অনুসরণ করতেন তবুও পরিত্রাণ নেই। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل.

অর্থ ঃ যদি মুসা (আলাইহিস্ সালাম) আজ তোমাদের মাঝে চলে আসতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। এবারে আপনিই একটু ভেবে দেখুন কোথায় মুসা (আলাইহিস্ সালাম) আর কোথায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আগমনের পর যদি অন্য নাবীর আনুগত্য না চলে তবে ইমাম?

সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আইনই মানুষের জন্য কল্যাণকর

এম.এ. হান্নান

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লিআলা রাসূলিহীল কারীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের হেদায়েতের জন্য মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে নাবী ও রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সাথে সাথে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, নীতিমালা সম্বলিত কিতাব আল্ কুরআন দান করেছেন। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন কুরআনের বাস্তব নমুনা। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আনীত বিধানকে বিশ্বাস করে মানুষ হয় মুমিন এবং আমল করে হয় মুসলিম। এর বিপরীত কুফর। মুসলিমদের জন্য ইহকালে রয়েছে শান্তি ও পরকালে রয়েছে মুক্তি। অপরপক্ষে কাফেরদের জন্য ইহকালে রয়েছে লাঞ্ছনা ও পরকালে রয়েছে শাস্তি। শান্তি ও মুক্তির পথ একটিই। আর তা হল কুরআন সুন্নাহ্ মোতাবেক জীবন যাপন করা। এর বিপরীত যত নীতিমালা আছে তা মানুষের তৈরি করা নীতিমালা, যা মানুষের জন্য গ্রহণীয় নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ''একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয়।'' আল্লাহ্ আরও বলেন, ''যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় হবে না এবং তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবে।''

ইসলামী আইনের উৎসমূল হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইনের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। রাষ্ট্রের শাসক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নিজ স্বার্থে আইন রচনা করে; যে স্বেচ্ছায় তার আইন মানে সে নিজ ব্যক্তিসত্তা একজনের হুকুমের সামনে বিসর্জন দেয়; তার প্রভুত্ব স্বীকার করে ও নিজে দাসত্ববরণ করে। কোনো মুসলিম আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মানুষের তৈরি করা আইনের কাছে মাথানত করতে পারেনা, যে পড়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।'

আল্লাহ্র আইনের প্রতি রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সকলেই মন প্রাণ দিয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এ আইনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে যদি পূরণ করা হয় তবে এ পার্থিব জগতে যেমন সাফল্যময় জীবন-যাপন করার

সৌভাগ্য হবে তেমনি সৌভাগ্য লাভ হবে পরকালেও। আর এর বিরোধিতা দ্বারা যেমন ইহকালে হবে অপমানজনক, তেমনি পরকালও হবে চরম অবমাননাকর। আর যারা কিছু আল্লাহ্‌র আইন মানবে কিছু মানব রচিত আইন মানবে তারাও ইহকালে হবে লাঞ্ছিত ও পরকালে হবে বঞ্চিত। ইসলামী শরীয়ত অর্থাৎ বিধান মানার ক্ষেত্রে আংশিক বা কিছু মান্য করা আর কিছু অমান্য করা কুফুরী। ইসলামী শরীয়ত পুরোপুরি মানতে হবে। আর এটাই ধর্ম মানা।

আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করো? তোমাদের মধ্যে এমন যারা করে তাদের এ শাস্তি ছাড়া কিছুই নাই যে, আর এ জগতে অপমানজনক জীবন যাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে'' (সূরাহ্ বাক্বারা)।

উক্ত আয়াত থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্‌র আইন মানতে হবে। মানব রচিত আইন মানার কোনো অবকাশ নেই। কারণ মানব রচিত আইন একটি মারাত্মক ব্যধি। মানব রচিত আইনের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শাসকবর্গের পরিবর্তন হওয়ার ফলে এ ধরণের আইন অপ্রয়োজনীয় হতে পারে এবং জনতার লোভ-লালসায় পর্যবসিত হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়তী আইন এ ধরণের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। জগতের বিরোধী দলের লোকেরা যখন সরকারী দলের সমালোচনা করে তখন তাদের প্রণীত আইনগুলোকেই অভিযোগ ও ভর্ৎসনার বিষাক্ত তীর নিক্ষেপের অভিষ্ট লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে।

আর বিরোধী দল সরকারী দলের আইনের তুলনায় নতুন আইনের নক্সা তুলে ধরে জনসাধারণকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আমরা সরকারের জনবিরোধী আইনকে উৎখাত করে আমাদের এই কল্যাণমুখী আইন প্রবর্তন করব। বিরোধী দলের সদস্যরা এহেন গতিধারা গ্রহণ করে তাদের সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবতার প্রতীক বলে ভাবতে থাকে। কেননা তারা জ্ঞাত আছে যে, আমরা যে আইনের বিরোধীতা করছি; তাও ভুল-ভ্রান্তির শিকার, মানুষেরই মস্তিষ্কপ্রসূত আইন। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে মানব রচিত আইনের গৌরব ও মহত্বের উজ্জ্বল দিবাকরটি অস্তমিত হবার পথে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এহেন মানব রচিত আইনের গৌরব সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

মানব রচিত আইন সবকালের জন্য স্থায়ী হয় না এবং সর্বজনীনতা লাভ করে না। কারণ মানুষ অতীতকে ভুলে যায়, বর্তমান সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে আর ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞানই রাখে না। মনের তাড়নায় যা করে কিছুক্ষণ পর তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তাই মানব রচিত সংবিধান বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ যে আইন দিয়েছেন তা সর্বযুগের সর্বজনের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা পত্র যা কোনো কালে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ ''রসূল যা কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন তা তোমরা আঁকড়িয়ে ধর, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক'' (সূরাহ্ হাশর)।

আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। রাজত্ব কেবল তাঁরই, তিনি একমাত্র প্রভু, সমস্ত মানব তাঁর দাস। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নাই। আল্লাহ্ ছাড়া মানবমণ্ডলীর উপর কেউ কোনো আদেশ-নিষেধ জারি করতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, ''সৃষ্টি যার, হুকুম চলবে তাঁর।'' আল্লাহ্ আরো বলেন, ''নিশ্চয়ই আমি আপনার (মুহাম্মাদ সাঃ) উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য, যা আল্লাহ্ আপনাকে বুঝিয়েছেন'' (সূরাহ্ নিসা)। আল্লাহ্ আরও বলেন, ''আল্লাহ্ ছাড়া কারও হুকুম চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'' (সূরাহ্ আনআম)।

আল্লাহ্ আরও বলেন, ''আমি আপনাকে শাসনকার্য পরিচালনার একটি নিয়ম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এর অনুগত হোন। আপনি অজ্ঞ লোকদের নফসের খেয়াল- খুশির অনুসরণ করবেন না'' (সূরাহ্ জাসিয়া)।

কুরআনে উল্লিখিত ঘোষণাসমূহে একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন মানার কথা বলা হয়েছে এবং শরীয়তের পরিপন্থী ও বিরুদ্ধাবাদীদের নির্দেশ ও কাজের আনুগত্যকে মানতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বিচার ফয়সালা করার জন্য কুরআনে আইন কানুন নাযিল করেছেন। আর তাই দিয়ে বিচার ফয়সালা করার কথা বলেছেন। যারা সেই মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে না তারাই জালিম। ইরশাদ হচ্ছে, ''আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে যারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা জালিম'' (সূরাহ্ মায়েদাহ্)।

বর্তমান বিশ্বে যারা নিজেদের তৈরি করা আইন প্রচলন করে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ভালো কাকে বলে এবং মন্দই বা কী? ন্যায়-অন্যায়ের রূপরেখা কি? সত্য-মিথ্যা এবং সভ্য তার মাপকাঠি কী? এদের দর্শনে এইগুলির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই।

এই সামান্য বিষয়ে বহু মতাদর্শের আবির্ভাব করে তারা মাপকাঠি হারিয়ে ফেলেছে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সভ্য-অসভ্য কোথা হতে এলো এবং এর মাপকাঠি কি তারা তা জানে না। কারণ তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। যার কোনো মাপকাঠি নাই। বর্তমান দুনিয়ায় কুরআন ও সুন্নাহ্ই সব কিছুর মাপকাঠি, যা কিয়ামত পর্যন্ত মাপকাঠি হিসাবে থাকবে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের শাসকগণের। যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মত পার্থক্য ও বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র কাছে ফিরে যাও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণকারী হও। পরিণতির দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা পত্র" (সূরাহ্ নিসা)।

এখানে সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্কে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সকল ঈমানদারবান্দাগণ, কুরআন ও হাদীসকেই সকল কিছুর মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তাই কোনো ঈমানদারকে কোনো কার্য ভালো কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় তা জিজ্ঞাসা করা হয়। তবে অল্পক্ষণের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে বের করে বলে দিতে পারবে যে কাজ করতে যাচ্ছে তা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়। এই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি কুরআন-সুন্নাহ্র উপরই আইন রচিত হয়েছিল। রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র আইনকে যখন বিদায় করে দিল তখন অবিশ্বাসী দার্শনিকগণ তাদের ভ্রান্ত দর্শন চালু করল। ফলে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা বা মাপকাঠি পাশ্চাত্য দেশগুলো হতে বিদায় নিল এবং ভাল-মন্দের ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করার জন্য তারা জনগণের মতামত যাচাই করে। সভ্যতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা না থাকায় সভ্যতা বিলুপ্ত হচ্ছে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাই তারা দিশেহারা হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে ফিরছে। বর্তমান বিশ্ব তার সাক্ষী।

জগতের মানুষের তৈরি আইন ও বুদ্ধি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য যা কিছু করেছে তা ছাই ভস্ম ছাড়া কিছুই না। এর দ্বারা মানুষের দুর্গতি পর্বত পরিমাণ বেড়েছে। দুনিয়াতে এই অবস্থা আখিরাতের যে আরও কী ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে।

অতএব গোটা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র আইন, তথা কুরআন-সুন্নাহ্ মোতাবেক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করা। তাহলে ন্যায় দূরীভূত হবে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, অসভ্য জাতি সভ্য হবে, কেউ কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং গোটা জাতি শান্তি ফিরে পাবে। আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ্র আইনই উপযুক্ত।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজের ভূমিকা

মোঃ জিনাতুল্লা সেখ

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যেমন আকাশে আলোর বিকিরণ করে, শক্ত লাঠির কর্ম ক্ষমতা অপরিসীম, ঠিক তেমন মানুষের জীবনের ভূমিকাও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত — শৈশব, কৈশর ও বার্ধক্য। শৈশব ও কৈশর অবস্থায় তেমন কোনো সুষ্ঠ চিন্তার বিকাশ ঘটে না। তাই মানুষের যৌবনকালই লড়াই-এর উপযুক্ত সময়। পক্ষান্তরে বার্ধক্য অবস্থায় আবার চিন্তাশক্তির বিলোপ ঘটে। তথাপিও আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা তরুণ বৃদ্ধ সর্বাবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা যদি তোমরা বুঝ (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৯/৪১)। তবে কিন্তু যৌবনকাল এ দুইয়ের ব্যতিক্রম। কারণ যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বা সম্পদ। যার প্রেক্ষিতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ''পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে''। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে , (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, (৩) দারিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে (মিশকাত হাঃ নং ৫১৭৪, সহীহ্ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং ৩৩৯৯, সহীলুল জামে হাদীস নং ১০৭৭)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের যৌবনকাল সময়টার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ সময় মানুষের মাঝে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটে। যেমন যৌবনকালে মানুষের চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, মননশক্তি, কর্মশক্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এক কথায় এ সময় মানুষের প্রতিভা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ সময়েই মানুষ অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যৌবনের তরতাজা রক্ত ও বাহুবলে শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে বীর বিক্রমে সামনে অগ্রসর হয়। এ বয়সে মানুষ সাধারণতঃ পূর্ণ সুস্থ ও অবসরে থাকে। তাই এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে কুরবানী করার উপযুক্ত সময়। সেই জন্যই এ প্রসঙ্গে ডাঃ লুৎফর রহমান বলেন গৃহ এবং বিশ্রাম বার্ধক্যের আশ্রয়। যৌবনকালে পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়াও রত্ন মানিক্য আহরণ সঞ্চিত কর যাতে করে বৃদ্ধ বয়সে সুখে থাকতে পারো। জর্জ গ্রসলিঙ বলেন, '' যৌবন যার সৎ ও সুন্দর এবং কর্মময় তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাই যৌবনকালকে নেআমত বলে গণ্য করা যায়।'' সেই জন্যই বলি, হে যুবক ও নওজোয়ানের দল ! তোমাদের এই জীবনের জন্য তোমরা তৈরি করো পর জীবনের সম্পদ। কারণ আমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী, হাদীস তিরমিযী হাঃ নং ২৪১৬ কিয়ামত অধ্যায়ে - কিয়ামতের দিন এই যৌবনকাল সম্পর্কে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীসে এসেছে ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সম্মুখ থেকে একটুকুও নড়াতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। (১) সে তার জীবনকাল কী কাজে শেষ করেছে। (২) তার যৌবনকাল কোন কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। (৩) তার সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে। (৪) কোন কাজে তা ব্যয় করেছে।(৫) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার উপর কতটা আমল করেছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী তিনি বলেছেন যে, ঐ যুবককেই আল্লাহ্‌র আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। দ্বীনদার চরিত্রবান আল্লাহ্ ভীরু যে কখনও শরীআত বিরোধী কোনো কর্ম করে না যেমন শিরক, বিদ্আত , যেনা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, লটারী, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, সন্ত্রাসী-কোনো অপকর্মে সে কখনো অংশ গ্রহণ করত না। এই যুবকই হল আল্লাহ্ ভীরু সেজন্য তারা আল্লাহ্‌র আরশের নীচে ছায়ায় শান্তিতে থাকবে (বুখারী ১৪২৩, ৬৩০৮, মুত্তাফাক আলাই, মিশকাত হাঃ ৭০১)। সেই যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে বড় হয়েছে আর এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। এই জন্যই বলা হয়েছে সংগ্রাম যৌবনের ধর্ম, একথা সর্বজন বিদিতি।

সত্যান্বেষী মানুষদের প্রতি

জাবির এইচ. মণ্ডল

(ক) ঈদ-উল-ফিতরের দিন। ইমাম সাহেব ঈদের ময়দানে পৌঁছেই ঈদের স্বলাতের পূর্বেই খুৎবা আরম্ভ করে দিলেন। বিষয়-টুপি। কারণ ময়দানে অনেকের মাথা খালি ছিল। বক্তব্যের ধরণ ছিল কিছুটা আক্রমণাত্মক। 'কোন আলেম বলেছে টুপি ছাড়াও স্বলাত হবে' আলেমদের ফাতাওয়া আলেমদের কাছে রাখেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের নিকট জানতে চাইলাম যে, এইভাবে ঈদের স্বলাতের পূর্বে খুৎবা দেওয়ার দলীল কোথায় পেলেন? উপস্থিত জনতার দৃষ্টি আমার দিকে হয়ে কিছু শোরগোল শুরু হল। তখন ইমাম সাহেব দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, ''বাদ দিন ওর কথা, খুৎবার দিকে মনোযোগ দিন — গ্রামে দু-একটি এই ধরণের ছেলে থাকবেই।''

(খ) ইংরেজি নববর্ষ এসেছে। এই সময় থার্টি ফার্স্ট নাইট, পহেলা জানুয়ারী, ডি.জে সহ ফিস্ট খাওয়ার ধুমধাম, গ্রিটিং কার্ড দেওয়ার হিড়িক সর্বত্রই। এই জাহেলিয়াত থেকে সতর্ক করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের পক্ষ থেকে জুমুআর খুৎবার মাধ্যমে ইমাম সাহেবরা যেন উক্ত বিষয়ে সতর্ক করে, তার জন্য প্রত্যেক মোকামীর ইমামদের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। এরকমই একটি পত্র আমার নিকট পৌঁছালে আমি অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় পত্রটি আমার এক ভাইকে জানিয়ে আমাদের ইমাম সাহেবকে বলার জন্য অনুরোধ করলাম। ভাই ইমাম সাহেবকে উক্ত বিষয়ে অবগত করালে প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান 'গ্রাম থেকে আমার ভাত মারবা নাকি।'

(গ) শবে-বরাতের সময়। জুমুআর দিন। ইমাম সাহেব খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে উঠেছেন। ইমাম সাহেবের শাণিত কণ্ঠে তীব্র আক্রমণ শবে-বরাতের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, শবে-বরাত বিদ্‌আত। যারা হালুয়া-রুটি খাবেন তাঁরা হারাম খাবেন। না খেয়ে ফেলে দিলে, যে জমিতে ফেলবেন সেই জমির ধানও হারাম। যে পুকুরে ফেলবেন সেই পুকুরের মাছও খাওয়া হারাম ইত্যাদি ...ইত্যাদি। স্মর্তব্য যে, আহ্‌লে হাদীস গ্রামগুলোতে শবে বরাতের ততটা গুরুত্ব নেই। তাই ইমাম সাহেবের লাঠির আঘাত খাওয়া বা ভাত উঠে যাওয়ার আশঙ্কা কোনোটিই নেই।

উপরোক্ত তিনটি ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এরকম শত শত উদাহরণ পেশ করা সম্ভব হবে, যাঁরা একটু সচেতনতার সাথে ইসলাম ধর্ম পালন করার চেষ্টা করেন তাদের পক্ষে। এছাড়াও এরকম ঘটনা কোনো একটি গ্রাম বা মহাল্লাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিটি মুসলিম কমিউনিটিতে বিদ্যমান। আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে আলেমগণ নাবীদের উত্তরসূরী। সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলেমগণের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা এবং তাঁদের সহচর্য লাভ আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু আলেম হয়ে যদি সত্য বলতে ভয় পায় বা সত্যকে গোপন করে, তাহলে সেই আলেমের মর্যাদা কোথায়?

বর্তমান গ্রাম্য মৌলবীগণ নিজ পরিবার, নিজ গ্রাম, নিজ মাসজিদে সংঘটিত বড় বড় শিরক, বিদআত তথা অনৈতিক কর্মের বিরুদ্ধে উদাসিন থাকেন এবং কখনও নিজেরাও তাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু অন্য গ্রাম-দল-মাযহাব-এর শিরক-বিদআত বা অনৈতিক কর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে তাঁরা সিদ্ধ হস্ত।

আহ্‌লে হাদীস গ্রামের মৌলবীগণ মৃতের বাড়িতে খানা খেয়ে ফাতাওয়া দেন যে, বেনামাযীর বাড়িতে খেতে পারলে মৃতের খানায় বাধা কোথায়? রমাযানের সেহেরী রান্নার জন্য জাগ্রত করতে তারা গজল-ক্বিরাত ও বক্তব্য প্রদান করে শিশু-বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তি সহ প্রতিবেশী অমুসলিম সম্প্রদায়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে পারত পক্ষে মোড়লদের চাকরগীরি করে থাকেন। মাসজিদের মাইকে হারানো সংবাদ পরিবেশন, জানাযার স্বলাত ঘোষণা সহ অন্যান্য বিষয়েও তৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করে থাকেন। তখন এটি হারাম বা বিদ্‌আতের কথা মনে থাকে না।

ঠিক একই চিত্র মাযহাবী গ্রামগুলোতেও। ধর্মের ঠিকা নেওয়া মৌলবীগণ আহ্‌লে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিষেদগার করলেও চাপা পড়ে থাকে বেনামাযীর বিধান, মদ-ঘুষ-সুদ, পণপ্রথা, অপসংস্কৃতি সহ বিবাহে ডি.জে.-এর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলি।

মদ-গাঁজা, পণপ্রথা, ব্যাভিচার, সুদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, আত্মসাৎ, গান-বাজনা, সিনেমা অশ্লীলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মানুষ প্রতিটি গ্রামেই কম-বেশি বিরাজমান। বিয়ের বাড়িতে ডি.জে-এর শব্দে পাড়া-প্রতিবেশি, শিশু-বৃদ্ধ-অসুস্থ মানুষদের আতঙ্কিত করে তোলে। এতদ্‌সত্বেও এই সমস্ত বিবাহ বয়কট করতে তাদেরকে দেখা যায় না। অবৈধ পণ প্রথার কারণে গরীব মেয়েদের বিবাহ পর্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়েছে কিন্তু পণ প্রথা যুক্ত বরের বিয়ে পড়িয়ে পেটুক মৌলবী ঠিকই কমিশন নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন।

বেনামাযীদের নিয়ে তাঁদের বা সংশ্লিষ্ট তথাকথিত মোড়লদের মাথা ব্যথা না থাকলেও ঠিকই কোনো একজন পাঁচ

ওয়াক্তের মুসল্লী টুপি ছাড়া স্বলাত আদায় করলে এদের রোযানলের খপ্পরে পড়ে।

ওয়ায-মাহফিল তথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 'রুজির মালিক আল্লাহ্'-এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রোথিত করলেও গ্রাম্য মৌলবীদের রুজির মালিক যে গ্রাম্য মোড়ল সর্দারেরা একথা মনে প্রাণে তারা বিশ্বাস করেন। হক বলা অথবা বাতিলের বিরোধিতার সময় ভাত উঠে যাওয়ার ভয়ে তাদের নীরবতা এ কথায় প্রমাণ করে।

দাওয়াত-তাবলীগের কাজে বর্তমান গ্রাম্য মৌলবীদের অলসতা সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগত। কিন্তু একজন সাধারণ শিক্ষিত ছেলে যদি দাওয়াতের কাজ করতে যায় তখন তাদেরকে উৎসাহ বা সংশোধণের পরামর্শ না দিয়ে দোকান বন্ধের ভয়ে বিরোধীতায় সিদ্ধহস্ত। তখন এই সমস্ত মৌলবীরা ফাতাওয়া দিতে পিছপা হন না — এদের ক্বিরাত শুদ্ধ নয়, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেনি ইত্যাদি। যেমনটি আমরা ডাঃ জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে দেখেছি।

বর্তমান সময় চলছে গলার জোরে ফাতাওয়াবাজী। যার যত থুতির জোর সে তত বড় বক্তা। সুর করে বক্তব্য না দিলে শ্রোতারা রস পায় না। আর একেই হাতিয়ার করে মাঠে নেমেছে এক শ্রেণির বক্তারা ব্যবসা করতে। অগ্রিম টাকা, ব্যাংকে ট্রান্সফার, ফিক্স রেট, মিথ্যা কাহিনী, জাল-যঈফ হাদীস আর কিছু ফজিলত বয়ান করে অজ্ঞ শ্রোতামণ্ডলীর মন জয় করে তাদেরকে করছে প্রতারিত। ধর্মের নামে তারা করছে লুঠতরাজ, তাবীজ-মাদুলী সহ শিরকের রমরমা ব্যবসা।

এহেন পরিস্থিতিতে সত্যানুসন্ধানী মানুষদের কুরআন ও হাদীস অধ্যায়ণ ব্যতীত কোনো গত্যান্তর নেই। জ্ঞানী পাঠকদের কুরআন-হাদীস অধ্যায়ণ পূর্বক আমল করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। আলেমগণ যেহেতু নাবীদের উত্তরসূরী, সেহেতু তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হন এবং তাঁদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন যাঁরা সত্যিকারার্থেই আলেম ও দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক। অন্যথায় শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ্)-র কথায় ''আদার বনে শিয়াল রাজাকেই মহারাজা মেনে নিয়ে তাকেই মুফতী মনে করা বসা উচিত নয়। ওয়াজেব হল, প্রকৃত আলেম খোঁজ করে তাকেই প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে তার ফাতাওয়া মত আমল করা।

মহান আল্লাহ্ বলেন, ''অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান'' (৩৯/১৭-১৮)।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১।প্রশ্ন : বায়আতে কুবরার ব্যাপারে কোন্ সূরার কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়?

উঃ— সূরাহ্ তওবার ১১১ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২। প্রশ্ন ঃ শয়তানের তীর্যক কণ্ঠ শুনার পর কুরায়েশ নেতারা কী করেছিল?

উঃ— কুরায়েশ নেতারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ইয়াসরেবী কাফেলার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তারা বলল, হে খাযরাজ লোকেরা! তোমরা নাকি আমাদের লোকটাকে বের করে নিয়ে যেতে চাচ্ছো এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের সাথে তাঁর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিকট তোমাদের চাইতে বড় বিদ্বেষী আর কেউ নেই (আহমাদ হাঃ ১৫৮৩৬, ইবনু হিশাম ১/৪৪৭ পৃঃ)।

৩। প্রশ্ন ঃ কুরায়েশ নেতাদের উক্ত কথা শোনার পর ইয়াসরিবের মুশরিক নেতারা কী বলেছিল?

উঃ— মুশরিক নেতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলেন যে, এরূপ কিছুই এখানে ঘটেনি এবং আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিনা। এমনকী খাযরাজ নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইও একই রূপ জবাব দেন (ঐ)।

৪। প্রশ্ন ঃ কুরায়েশ নেতারা সা'দ বিন উবাদাহ্ কেন এবং কীভাবে ধরে নিয়ে আসেন?

উঃ— কুরায়েশ নেতারা ইয়াসরিবের নেতাদের কথায় পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে না পেরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুনরায় আসেন। তখন কাফেলা মদীনার পথে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। সা'দ বিন উবাদাহ্ পিছনে পড়ে যাওয়ায় তার দুই হাত পিছন দিকে শক্ত করে বেঁধে মক্কায় নিয়ে আসেন।

৫। প্রশ্ন ঃ কে কে সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে ছাড়িয়ে নেন এবং কেন?

উঃ— মুত্ব'ইম বিন আদী ও হারেস বিন হারব বিন উমাইয়া এসে ছাড়িয়ে নেন। কেননা তাদের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথে সা'দের আশ্রয়ে থেকে যাতায়াত করত।

৬। প্রশ্ন ঃ বায়আতের ফলাফল কী ছিল?

উঃ— (ক) গোত্রীয় হানাহানিতে বিপর্যস্ত ও যুদ্ধ ক্লান্ত আউস ও খাযরাজ গোত্র পুনরায় ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ হল।

(খ) তাদের মধ্যে গোত্রীয় জাতীয়তার উপরে নতুন ঈমানী জাতীয়তার বীজ রোপিত হল। যা তাদেরকে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত করে তুলল।

(গ) বহিরাগত সুদী কারবারী ইহূদী-নাসারাগণ আউস ও খাযরাজ গোত্রের যুদ্ধ লাগিয়ে যে অর্থনৈতিক ফায়েদা লুটে আসছিল তার অবসানের সূচনা হল।

(ঘ) এর ফলে হিজরতের ক্ষেত্র প্রশস্ত হল এবং হিজরতের পূর্বেই ইয়াসরাববাসীগণ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বরণ করে নেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

(ঙ) নতুন ঈমানী জাতীয়তার অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ইয়াসরাববাসীগণ মক্কার নির্যাতিত মুহাজিরগণকে নিজের ভাই হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল?

৬। প্রশ্ন ঃ বায়আতের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কী কী?

উঃ— (ক) ইসলামের প্রসার ও তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার ব্যাপক প্রচারের মধ্যে। তাই ইসলামের প্রচারের ছোটখাটো সুযোগকেউ সংস্কারককে কাজে লাগাতে হবে।

(খ) কেবলমাত্র পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের দাওয়াত দিতে হবে।

(গ) নিজ দেশে অসহায় ভাবলে অন্য দেশে হিজরত করে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

(ঘ) তাওহীদের দাওয়াতের প্রসারের জন্য চাই দূরদর্শী, উদ্যমী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল যুবক।

(ঙ) দাওয়াত ও বায়আতের মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ বিপ্লব সম্ভব।

(চ) দাওয়াতের সফলতার জন্য কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য ও দৃঢ়তা এবং নিখাদ আদর্শনিষ্ঠা অপরিহার্য।

৭। প্রশ্ন ঃ বায়আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্যাতিত মুসলিমদের কোথায় হিজরতের নির্দেশ দেন?

উঃ— ইয়াসরিবে হিজরতের নির্দেশ দেন।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ বেতর স্বলাতে কোন্ কোন্ সূরাহ্ পাঠ করতে হবে? শেষ রাকাআতে কি তিন ক্বুল পড়া আবশ্যিক? দলীল সম্মত উত্তর দানে বাধিত করবেন। — মনিরুল ইসলাম, জনার্দনপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তিন রাকাআত বেতর আদায় করতেন। প্রথম রাকাআতে সূরাহ্ আ'লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরাহ্ কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করতেন .... (নাসায়ী হাঃ ১৬৯৯, দারেমী হাঃ ১৬৩০, সূত্র সহীহ্)। এ হাদীসের ভিত্তিতে বিতরের তিন রাকাআতে পর্যায়ক্রমে সূরাহ্ আলা, কাফিরূন এবং ইখলাস পড়া সুন্নাত, আবশ্যিক নয়।

একটু ভিন্নতার সাথে একই রকম হাদীস আম্মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে শেষ রাকাআতে তিন ক্বুল (নাস, ফালাক ও ইখলাস) পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে (আবু দাউদ হাঃ ১৪২, তিরমিযী হাঃ ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১১৭৩)। কিন্তু এ হাদীসের সূত্র একাধিক কারণে যয়ীফ। আমলের যোগ্য নয়। আমার জ্ঞান অনুযায়ী এ হাদীস ছাড়া শেষ রাকাআতে তিন ক্বুল পাঠ করার আর কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। কাজেই উক্ত হাদীসের উপর আমল করে তিন ক্বুল পড়া যাবে না।

২। প্রশ্ন ঃ সাতদিনের পরে আক্বীক্বাহ্ করা চলবে কি না? সহীহ্ হাদীসের আলোকে উত্তর দিবেন। — ক্বারী সানাউল্লাহ্, শেরশাহী, মালদা।

উত্তর ঃ এ মর্মে উলামাগণ দুটি মতামত পেশ করেছেন। (ক) সাতদিনের পরে আক্বীক্বাহ্ করা যাবে না, কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আক্বীক্বার জন্য সপ্তম দিন নির্ধারণ করেছেন এবং সপ্তম দিনের পরে আক্বীক্বার বৈধতার সমর্থনে হাদীসের ভাণ্ডারে কোনো স্পষ্ট সহীহ্ দলীল বর্ণিত হয়নি। (খ) কোনো কারণে সপ্তমদিনে আক্বীক্বাহ্ করা সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিনে, আর সেই দিনেও সম্ভব না হলে একুশতম দিনে আর তাও সম্ভব না হলে জীবনে যে কোনো দিন আক্বীক্বাহ্ করা যেতে পারে। এমত পেশ করেছেন হাম্বেলী উলামাগণ, আরও অনেকে (লাজনা

৮। প্রশ্ন ঃ মুশরিক নেতারা নির্যাতিত মুসলিমদের হিজরতের বাধা দিতে থাকল কেন?

উঃ— ইসলামের প্রচার প্রসারের বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

৯। প্রশ্ন ঃ হিজরতে বাধা দেওয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি কী কী?

উঃ— অর্থনৈতিক কারণ ছিল - মক্কা থেকে ইয়াসরিব হয়ে সিরিয়ায় তাদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা পরিচালিত হত। সেটা বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর রাজনৈতিক কারণ এই যে, ইয়াসরিবে মুহাজিরগণের অবস্থান সুদৃঢ় হলে এবং ইয়াসরিববাসীগণ ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিলে তা মক্কার মুশরিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। যা মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। যাতে তাদের জান-মাল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু হুমকির মধ্যে পড়বে।

১০। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হিজরতের পূর্বে কোন্ কোন্ সাহাবী হিজরত করেন?

উঃ— সর্বপ্রথম মুস'আব বিন উমায়ের, অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম। অতঃপর আগমন করেন বেলাল, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ও আম্মার বিন ইয়াসির। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্বাব আসেন বিশ সাথী নিয়ে। অতঃপর আগমন করেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম) স্বয়ং (বুখারী হাঃ ৩৯২৫, রসূল (সঃ) ও সাহাবীগণের মদীনায় হিজরত অনুচ্ছেদ)।

১১। প্রশ্ন ঃ কোন্ সাহাবী বায়আতে কুবরার বছর কিছুক্ষণ পূর্বে কোলের পুত্রসহ স্বস্ত্রীক মদীনায় হিজরত করেন ও ইতিপূর্বে স্বস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেছিলেন?

উঃ — আবু সালমা মাখযুমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

১২। প্রশ্ন ঃ আবু সালমা মাখযুমী মদীনায় হিজরতকালে কোন ঘটনার সম্মুখীন হন?

উঃ— পথি মধ্যে আবু সালমার গোত্রের লোকেরা এসে তাদের বংশধর দাবী করে শিশু পুত্রসহ সালমাকে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর উম্মে সালমার পিতৃপক্ষের লোকেরা এসে তাদের মেয়েকে জোর করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। ফলে আবু সালমা নিরূপায় হয়ে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে একাই হিজরত করেন।

দায়িমাহ্ ২/৩২৬, মাকালাত ৫/২০৬)। এঁদের পেশকৃত দলীল সমূহ — (১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, আক্বীক্বাহ্ জবাই করতে হবে ৭ দিনে অথবা ১৪ দিনে অথবা ২১ দিনে (বাইহাকির সুনানুল কুবরা হাঃ ১৯২৯৩, তাবারানির মু'জামুল আউসাত হাঃ ৪৮৮২)। কিন্তু এ হাদীসের সূত্রে রয়েছে প্রসিদ্ধ যয়ীফ রাবী ইসমাঈল ইবনু মুসলিম আল-মাক্কী এবং কাতাদাহ্ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে এ হাদীস সর্বসম্মতিক্রমেই যয়ীফ আমলের যোগ্য নয়। এর সমর্থনে হাফেয যুবাইর আলী যাঈ এই অর্থেই আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্-র মত পেশ করেছেন। কিন্তু একজন তাবেয়ীর মত কীভাবে শারয়ী দলীল হতে পারে?

(২) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবুঅত প্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের আক্বীক্বাহ্ করেছেন (তাহাবির মুশকিলুল আসার হাঃ ১০৫৩, তাবারানির মু'জামুল আউসাত হাঃ ৯৯৪, আল্ মুখতারাহ্ হাঃ ১৮৩৩ সূত্র হাসান। আলবানী হাসান এবং আব্দুল মালেক দাহীশ ও হাফেয যুবাইর আলী যাঈ এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন। মিশকাত ৫/২০৬)। উক্ত হাদীস সম্পর্কে সামান্য ভাবলেই বুঝা যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের আক্বীক্বাহ্ করেছিলেন নবুঅত পাওয়ার পরে পরে আর সপ্তম দিন নির্ধারণ করেছেন অনেক পরে। সুতরাং হাদীসটি মানসূখ (রহিত) এখন আর দলীলের যোগ্য নয়।

(৩) সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُسَمَّى.

সকল শিশুই তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তারা মাথা ন্যাড়া করতে হবে (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩১৬৫, তিরমিযী হাঃ ১৫২২, সূত্র সহীহ্। আলবানী সহীহ্ এবং হাফেয যুবাইর আলী যায়ী হাসান বলেছেন)। যেহেতু শিশু বন্ধক থাকে, তাকে বন্ধক মুক্ত করতেই হবে, ফলে সাত দিনের পরে হলেও আক্বীক্বাহ্ করতেই হবে।

আমি বলছি ঃ তাদের কথা অনুযায়ী আক্বীক্বাহ্ করা অজেব। অথচ একথা কেউ বলেননি। বরং এ মর্মে সবাই একমত যে, আক্বীক্বাহ্ করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো শারয়ী কারণে আক্বীক্বাহ্ না হয় যেমন, যথেষ্ট চেষ্টা করার পরেও সাত দিনের মধ্যে আক্বীকার পশু খুঁজে (কিনতে) পাওয়া গেল না। এহেন অবস্থায় পশু পাওয়ার সাথে সাথেই আক্বীক্বাহ্ করতে হবে। তার জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করে কোনো প্রকার বিলম্ব করা যাবে না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৩। প্রশ্ন ঃ কুনূতে বিতরের দুআর শব্দাবলি কি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বহুবচন প্রমাণিত আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন। — হাফেয আব্দুস সাত্তার, দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, দুআটির শব্দাবলি, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বিশুদ্ধ সূত্রে বহুবচনও বর্ণিত হয়েছে —

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّ الَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ.

উচ্চারণ ঃ আল্ল-হুম্মাহদিনা ফীমান হাদায়তা, অ'আ-ফিনা ফীমান আ-ফায়তা, অতাওয়াল্লানা ফীমান তাওয়াল্লায়তা, অবা-রিক লানা ফীমা-আত্বায়তা, অক্বিনা শার্রামা-ক্বযায়তা, ইন্নাকা তাক্বযী অলা-ইউক্বয - আলায়কা। ইন্নাহূ লা-ইয়াযিল্লু মাওঁ অলায়তা, তাবা-রকতা রব্বানা-অতা'আলায়তা (সহীহ্ ইবনু হিব্বান হাঃ ৭২২, মু'জামুল কাবীর লিত্ তাবারানী হাঃ ২৭০০, তাবারানির দুআ গ্রন্থ হাঃ ৭৩৫, শায়খ আলবানী এবং শু'আইব আরনাউত এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)।

৪। প্রশ্ন ঃ স্বলাতে ঈদের পর এক মুমিনের অপর মুমিনের সাক্ষাৎ হলে কী বলে দুআ দেওয়া যেতে পারে? — আব্দুল্লাহ্ সানাবিলী, তোফাপুর, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আল্ আলহানী বলেন, আমরা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন আবূ উমামাহ্ এবং অসেলা ইবনে আসকা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-র নিকট আসতাম এবং তাঁদের

বলতাম- تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَ مِنْكُمْ فَيَقُوْلَانِ وَ مِنْكُمْ وَ مِنْكُم.

উচ্চারণ ঃ তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না-অমিনকুম’ তখন তাঁরা বলতেন, অ মিনকুম অ মিনকুম’ (মুখতাসারু ইখতিলা ফিল উলামা লিত্ব-ত্বহাবী ৪/৩৮৫, ইখতিসারুল জাস্‌সাস ৪/৩৮৫, সূত্র হাসান। আলবানী, হাফেয যুবাইর আলী যাঈ হাসান বলেছেন)। জুবাইর ইবনু নুফাইর (রাহেমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ঈদের দিন পরস্পরের সাথে দেখা হলে একে অপরকে বলতেন, তাকাব্বাল্লাল্ল-হু মিন্না - অ মিনকা’ (আল্ জুযুস সানী মিন কিতাবি স্বলাতিল ঈদাইন মাখতূত মুস্তাওয়ার ১/২২ সূত্র হাসান। হাফেয যুবাইর আলী যাঈ এর সূত্রকে হাসান বলেছেন)।

৫। প্রশ্ন ঃ ইক্বামাতদাতার কি ইমামের পেছনে অথবা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো অপরিহার্য? কারণ কাতারের বাম দিকে থেকে ইক্বামাত দিলে লোক অভিযোগ করছে। — মনিরুল ইসলাম, জনার্দনপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ইকামাত কোন দিকে থেকে দিতে হবে, ডান দিক থেকে না বাম দিক থেকে, কোনো হাদীসে এর দিক নির্ধারণ করা হয়নি। কাজেই ইমামের ডান থেকে হোক বা বাম থেকে কিংবা ইমামের ঠিক পেছন থেকে, সবদিক থেকেই ইক্বামাত দেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে কোনো একটি অবস্থার উপর মানুষের অভিযোগ করা সঠিক হবে না। তেমনিভাবে বাম দিক থেকে ইক্বামাত দেওয়াকে অপছন্দনীয় বলার কোনো দলীল নেই (তাওযীহুল আহকাম ১/২৫১)।

৬। প্রশ্ন ঃ ঈদের দিন ঈদগাহ্ থেকে মাইকে বার বার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, তাড়াতাড়ি আসুন আর বেশি সময় নেই। অনুরূপভাবে ঈদগাহে দাঁড়িয়ে মাইকে তাকবীর পাঠ করার শারয়ী বিধান কী? দলীল সহ জানাবেন। –– মুযাম্মিলুল হক, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ইবনু জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ও জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে আত্বা সংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা দু’জনে বলেন —

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِىْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِىُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَ لَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَ لَا إِقَامَةَ ، وَ لَا نِدَاءَ، وَ لَا شَىْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَ لَا إِقَامَةَ.

(নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জীবদ্দশায়) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের স্বলাতের জন্য) আযান দেওয়া হত না। ইবনু জুরাইজ বলেন, আমি আত্বাকে এ বিষয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আত্বা বললেন, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, ঈদুল ফিতরের স্বলাত আদায়ের জন্য ইমাম বের হবার সময় বা ইমাম বের হওয়ার পর কোনো আযান নেই, ইক্বামাত নেই, কোনো আহ্বান নেই এবং এ ধরণের কোনো কিছুই নেই। সেদিন কোনো ডাকাডাকি নেই, কোনো ইক্বামাতও নেই (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৮৮৬)। উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের স্বলাতের জন্য কোনো প্রকার ঘোষণা বা ডাকাডাকি জায়েয নয়। না মাসজিদ থেকে আর না ঈদগাহ থেকে। অনুরূপভাবে ঈদগাহে দাঁড়িয়ে তাকবীর পাঠ করা এবং উপস্থিত মুসল্লীদের তাকবীর পাঠ করার তালকীন করা শরীয়ত সম্মত কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এলাকায় চাঁদ না দেখা যায় এবং বাইরের কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ সম্পর্কে জানা যায়, তখন তার ঘোষণা দেওয়া জায়েয। আর তাতে মাইকের সাহায্যও নেওয়া বৈধ। (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

৭। প্রশ্ন ঃ নিম্নোক্ত হাদীসটি কি সহীহ্? আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি কোনো শারয়ী কারণ কিংবা কোনোরূপ রোগ ছাড়া রমাযান মাসের কোনো একটি সিয়াম ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাহলে সারা জীবন সিয়াম পালন করেও তার কাযা আদায় হবে না (আবূ দাঊদ হাঃ ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৬৭২, জামে উত্ তিরমিযী হাঃ ৭২৩)। এর হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন। — আব্দুল মান্নান, চপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

উত্তর ঃ হাদীসের সূত্র সর্বসম্মতিক্রমেই যয়ীফ।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১১.০৫.১৯ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব সূরাহ্ 'স্বাফ' এর ১০-১৪ নং আয়াতগুলোর তেলাঅত করেন এবং তার যথার্থ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসী বান্দাদের এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলেন, এমন এক ব্যবসার কথা যে ব্যবসায় কোনো ক্ষতি নেই শুধুই লাভ অর্জিত হয়। আর সেই লাভজনক ব্যবসা হলো (ক) দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন। (খ) ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তথা জিহাদ করা। উক্ত ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সুবিধা বা সুফল পাওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে তা হলো পাপরাশী থেকে মুক্তি এবং কাঙ্খিত জান্নাত প্রাপ্তি। শুধু তাই নয় আল্লাহ্ তাআলা দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ তা হলো আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। একজন আল্লাহ্‌ওয়ালার কাছে এর চাইতে বড়ো লাভ আর কী হতে পারে। এই লাভকে আল্লাহ্ অন্যত্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৯/১১১)। আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে (দ্বীনের) সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৭)।

উপরোক্ত কল্যাণগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব শত হলো ঈমানদারদেরকে ঈমানের দাবী সমূহ পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসী বান্দাদের তাঁর সাহায্যকারী হতে বলেছেন যেমন মারয়ম তনয় ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর শিষ্যদের সাহায্যকারী হতে বলেছিল। তাঁর শিষ্যরা তাঁর সক্রিয় সাহায্যকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাঁরা তাঁর সাহায্যকারী হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় তাদেরকে শক্তিশালী এবং বিজয়ী করেছিলেন। তাই আমরাও উক্ত সুফলগুলো পাওয়ার যোগ্য অধিকারী তখনই হতে পারব যখন আমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য অকুণ্ঠভাবে দানের হাতকে প্রসারিত করতে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হতে পারব। আমাদের দেশে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোক যুগ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও আলেম দ্বীনকে গালাগাল করছে। অর্থ সংকটের কারণে তথাকথিত পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যভিত্তিক জওয়াব দানে বিলম্ব ঘটছে। আল্লাহ্ বলেন, আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্‌র শত্রুদের আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন (সূরাহ্ আনফাল ৬০)।

তাই কৃত্রিম অর্থ সংকটের কারণে যদি আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারি, তাহলে আমাদের এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া অর্থ সংকটে থাকার জন্য কোনো যোগ্য সুলেখকের কাছ থেকে তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করতেও আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, অর্থ সংগ্রহে আমাদের নীতিহীন হলে চলবে না। হালাল উপার্জন হতেই আমাদের অর্থ সংগ্রহে অগ্রণী হতে হবে। অতীতের কোনো ভুল ঘটনার কারণে ভবিষ্যতেও একই ভুল যাতে সংঘটিত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। তাই আসুন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের রমাযান মাসের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করে দানের হাতকে আরো সুপ্রশস্ত করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

অদ্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ —

১। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি ব্লক আগামী ৯ই জুনের জেলা সভায় তাদের নির্ধারিত ৭ হাজার টাকা জেলা ক্যাশিয়ারের হাতে জমা করবেন — ইনশাআল্লাহ্।

২। প্রতিটি ব্লক তাদের প্রত্যেকটি মোকামীর নাম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জেলা WhatsApp-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন।

৩। প্রতিটি ব্লকে তাদের চাহিদা মতো সদস্য ফর্ম যথা সময়ে সরবারহ করা হবে।

৪। জেলা জমঈয়তের পক্ষ হতে হজ্জ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে আগামী জুন মাসের ৮ তারিখ জেলা অফিসে সকাল ৯ ঘটিকায়।

৫। বিগত শা'বান মাসের চাঁদের সঠিক সংবাদ প্রদানের মতোই আগামী শওয়ালের চাঁদের সঠিক সংবাদ ও যথাযথভাবে WhatsApp-এর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। ইতি —

জেলা সম্পাদক